ত্রৈমাসিক

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ ঃ ৬ সংখ্যা ঃ ২১
জানুয়ারী-মার্চ ২০১০

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৬ সংখ্যা : ২১

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারী-মার্চ ২০১০

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭
মোবাইল : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮ সম্পাদনা বিভাগ, ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯ বিপণন বিভাগ
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA ৮৮৭২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০০৯
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১ পৃষ্ঠা ৫-৮

সম্পাদকীয়

ইসলামী আইনে ব্যক্তির অবস্থান ও কল্যাণের পূর্ণতা

আইনের সম্পর্ক জীবনের সাথে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পর্ক জীবন ব্যবস্থার সাথে। আর জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে জীবনের সমস্ত দিককে নিয়ে। জীবন একটি খণ্ডিত সময়। জীবনের পর মৃত্যুর পরপারে অখন্ড সময়। সে সময়ের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো আইনও নেই।
মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনে আমাদের একটি নির্ধারিত সময় দিয়েছেন। সেই সময়ের পরে কেউ আর বাড়তি এক সেকেন্ডও সময় পাবে না। এই সময়ে আমাদের কাজও তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই কাজগুলো করার নামই জীবন। তারা কি আল্লাহর ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা চায় ? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে।' (আলে ইমরান ঃ ৮৩) 'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে (আল্লাহ প্রদত্ত) জীবন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, সে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সরল সোজা দীন তথা জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (আর-রূম-৩০)
ব্যক্তি থেকে জীবনের সূচনা। ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং পরিবার থেকে সমাজ। ব্যক্তির আকিদা বিশ্বাস, ব্যক্তির চিন্তা কল্পনা, ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দ, ব্যক্তির সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, ব্যক্তির ভালো লাগা মন্দ লাগা, ব্যক্তির আবেগ অনুভূতি, এমনিতর হাজারো বিষয় ব্যক্তির সাথে জড়িত। ব্যক্তির একান্ত ভুবনে এগুলোকে সে নিজের মতো করে গড়ে নেয়। এগুলোর ভালো মন্দ এবং ভুল নির্ভুলের জন্য ব্যক্তি নিজেই দায়ী। তবে সে যাই করুক আল্লাহর ব্যবস্থার বাইরে সে যেতে পারবে না। তার জন্য আল্লাহ যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তার মধ্যে এবং অন্যান্য জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, অন্যদের ব্যবস্থার মধ্যে কোনো নির্বাচন নেই। ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী তাদের চলতে হবে। নিজের ইচ্ছামত বিধান তৈরি করার ক্ষমতা তাদের নেই। অন্যদিকে মানুষকে যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তাকে নির্বাচন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আর এ জন্যই পরবর্তী পর্যায়ে তার জবাবদিহিতার প্রশ্ন এসেছে।
ব্যক্তির আকিদা বিশ্বাস। যেটা সত্য সেটাই তাকে পোষণ করতে হবে। এ জন্য ব্যক্তিকে একা ছেড়ে দেয়া হয়নি। সত্য মিথ্যা উভয়টি দিয়ে তার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। তাকে আসল সত্যটি জানতে হবে এবং খুঁজে বের করে নিতে হবে। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন, 'পাঠ কর এবং তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন–শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।' (আল-আলাক ঃ ৩-৫)

মানুষকে অবশ্যই জ্ঞানচর্চা করতে হবে। প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে। আর এ জ্ঞান চর্চা করার সমস্ত উপাদান ও পরিবেশ আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন। আবার এ জন্য প্রতি যুগে যুগ অনুযায়ী বাণীও তাঁর কাছ থেকে এসেছে। এই বাণী মানুষের এই জ্ঞান চর্চা করার সঠিক পথ নির্দেশ করেছে। এই বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে ঃ '(আল্লাহর মনোনীত ব্যবস্থা) ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন তথা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তা কোনো ক্রমেই কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত।' (আলে ইমরান ঃ ৮৫) সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।'

সমগ্র কুরআনে নিপুণ যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপনের পরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত আকিদা বিশ্বাস পোষণ করাই মানুষের জন্য উপযোগী এবং এই বিশ্বাস পোষণ না করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই এরি ভিত্তিতে ব্যক্তি মানুষের জীবন গড়ে উঠবে। তার চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ অপছন্দ, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, ভালো লাগা মন্দ লাগা, আবেগ অনুভূতি সবকিছুই ইসলামী বিধানের আওতায় গড়ে উঠবে।

আকিদা বিশ্বাস এবং তার ভিত্তিতে কর্ম এভাবে মানুষের ব্যক্তি জীবন গড়ে ওঠে। ব্যক্তি জীবনের যাবতীয় কর্ম ব্যক্তির সাথে সাথে একটি পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেও বিস্তৃত হয়। আর সেখান থেকে তা সামাজিক পরিবেশের সাথেও সংশ্লিষ্ট হয়। এসব অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিধান রচিত হয়। এগুলো জীবনের ও সময়ের প্রয়োজন। এ বিধান আল্লাহ নিজেই রচনা করে দিয়েছেন। একেই বলা হয় ইসলাম। ইসলাম একটা আকিদা বিশ্বাস, একটা কর্মপদ্ধতি, একটা ব্যবস্থা, একটা জীবন ব্যবস্থা এবং একটা জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র। ইসলাম মানুষের পৃথিবীতে বসবাসের জন্য একটি জীবন নকশা তৈরি করে এবং সেই নকশা অনুযায়ী তাকে পরিচালিত করে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কোনো দিককে ইসলাম তার নকশার আওতার বাইরে রাখেনি। প্রত্যেকটি দিককে ইসলাম পরিচালনা করেছে গভীর দায়িত্বশীলতার সাথে।

আসল দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর বর্তায়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে এ দায়িত্ব গুরুত্ব লাভ করে। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও একটা দায়িত্ব আছে আর সে দায়িত্ব মূলত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তি মিলেই পরিবার, ব্যক্তি মিলেই সমাজ ও রাষ্ট্র। ব্যক্তি না থাকলে এগুলো কিছুই নেই। এ জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যক্তিকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। ব্যক্তির সমস্ত কাজের হিসাব নেবেন। কোনো সমাজ, পরিবার বা রাষ্ট্রের কাজের হিসাব নেবেন না। কাজেই ব্যক্তি কোনো পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের ওপর দায় চাপিয়ে দিয়ে পার পাবে না। 'যে দিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে।'(আশ-শু'আরা ঃ ৮৮-৮৯)

ব্যক্তির মাধ্যমেই একটা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। একটা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি ও রসম রেওয়াজ গড়ে ওঠে। ব্যক্তি মিলেই সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, রসম ও রেওয়াজ প্রচলিত হয়। ব্যক্তির যেটা অভ্যাস সমাজ ও রাষ্ট্রের সেটা সংস্কৃতি।

এভাবে মানুষের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। গড়ে ওঠে একটা সভ্যতা একটা সংস্কৃতি। এ সভ্যতা ও সংস্কৃতি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গড়ে উঠলে মানবতার জন্য কল্যাণ, ইনসাফ ও মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়। আর যদি আল্লাহর বিধানের আওতার বাইরে অবস্থান করে তাহলে তার কাছ থেকে কল্যাণ, মর্যাদা ও ইনসাফের আশা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এ দু'ধরনের সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া যায়। একটাকে বলা যায় ইলাহী সভ্যতা এবং অন্যটাকে তাগুতী সভ্যতা। ইলাহী সভ্যতা আল্লাহর বিধানের আওতাধীন, যার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে আল কুরআন। অন্যদিকে তাগুতী সভ্যতা আল কুরআন ছাড়া অন্য চিন্তা স্রোত এবং চিন্তা দর্শনের আওতাধীন। মানুষের নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা দর্শন এবং অন্য বিকৃত আসমানী কিতাবগুলোর চিন্তা দর্শন একই পর্যায়ভুক্ত। কারণ আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে যে বিকৃতি ঘটেছে সেগুলো আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক। তাই এগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য কল্যাণ নেই। মানুষ যতই বুদ্ধিচর্চা করুক অহীর সাহায্য ছাড়া তা কোনো দিন সঠিক পথাশ্রয়ী হতে পারে না। অতীতের সভ্যতাগুলো নিনেভা, মেসোপটেমিয়া, মিসরীয় ইত্যাদির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে নবী, অহী ও আসমানী কিতাবের সাক্ষাত পাওয়া যায়। এর সাথে বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ হয়ে একটি কল্যাণকর সভ্যতা ও জাতির জন্ম হয়েছে। আসমানী বিধানের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা বিকৃত সংযোগের পর সভ্যতা ও জাতি ধ্বংস হয়েছে।

আল-কুরআনের যুগ শুরু হবার পর মুসলমানদের কুরআনের সাথে শক্তিশালী ও দুর্বল সংযোগের হাজার বছর পর্যন্ত তারা বিশ্বে নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রেখেছিল এবং বিশ্বে এ বিধানের কল্যাণে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব বিরাজিত ছিল। এই হাজার বছরে তারা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করেছিল, তার কোনোটি কুরআনের বিধানের বাইরে ছিল না। তারপর কুরআনের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনায় পরিচালিত বিশ্বের বিগত দুশো বছর অশান্তি, অস্থিরতা, দুস্কৃতি, দুরাচার ও যাবতীয় অকল্যাণকে মানুষের সভ্যতার নামে বিকৃত মানবিক সভ্যতায় পরিণত করেছে। এ সভ্যতা ইতিমধ্যে আমাদের দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সীমাহীন ধ্বংসকারিতা বরং মানবিক সভ্যতার বিলুপ্তির ভীতি উপলব্ধির কারণে এখনো তা একটু পিছিয়ে আছে মাত্র।

অথচ হাজার বারশো বছর ধরে ইসলামী বিধান যখন বিশ্বকে পরিচালিত করে তখন মুসলিম শাসকরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন। মানুষের মনে ও জীবনে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শান্তি বিরাজিত থাকে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত প্রতারণামূলক ডিপ্লোম্যাসি মুসলমানরা ব্যবহার করেনি। ইসলামী সভ্যতার আওতায় মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চা করে বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্তমান ও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার বুনিয়াদ রাখে। মুসলমানরা বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র আবিষ্কার, তৈরি ও ব্যবহারের কাজে লাগায়নি। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। মুসলমানরা ইসলাম বিজ্ঞানের সামান্যতমও বিরোধী ছিল না।

আল কুরআনের অনুসরণ করে মুসলমানরা বিশ্বে একটি নতুন জাতি ও সভ্যতার উদ্ভব ঘটিয়েছে। বর্তমানে কুরআনের সাথে দুর্বলতর সংযোগরক্ষাকারী এ সভ্যতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি কল্যাণের বার্তাবহ। ইসলামের সামান্যতম অনুশাসন মেনে চলে যে মুসলমান সে নিজেকে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে। বর্তমান বিশ্বে কেবল মুসলিম সমাজের মধ্যে এ ভাবধারা বিরাজিত আছে। বাকি সমগ্র বিশ্ব কেবল আত্মস্বার্থ কেন্দ্রীক সভ্যতারই পরিচর্যা করে চলছে। এমনকি তাদের সমস্ত ধর্মীয়, মিশনারী ও মানব কল্যাণমুখী তৎপরতার পেছনেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ লুকিয়ে আছে। নিস্বার্থ মানব কল্যাণের কোনো ধারণাই সেখানে নেই।

ইসলামী আইন ও ইসলামী সভ্যতা বিশ্বকে কি দিয়েছে, একথা যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে আমরা দেখবো,

এক. ইসলামী আইন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ খতম করে দিয়েছে। সাদা কালোর ব্যবধান দূর করেছে। অধিকারের দিক দিয়ে ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সবল-দুর্বল, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সবাইকে এক সারিতে বসিয়েছে।

দুই. ব্যক্তিকে জবাবদিহিতার কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা পূর্ণতা লাভ করেছে।

তিন. ইনসাফ ও ন্যায় বিচারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। সারা বিশ্বে মানুষের অধিকারকে সমুন্নত করেছে।

চার. ইসলামী আইন মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা দিয়েছে। নাহক প্রাণ হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং না হক একজন মানুষকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল গণ্য করেছে।

পাঁচ. ইসলামী আইন মানুষের হালাল তথা বৈধ উপার্জনের সমস্ত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং হারাম ও অবৈধ উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

ছয়. ইসলামী আইন ও ইসলামী সভ্যতা মানুষের নৈতিক বৃত্তিকে উন্নত করেছে এবং নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর গড়ে তুলেছে। ফলে অশ্লীলতা ও অসততা মাথা তুলতে পারেনি।

সাত. ইসলামী আইন সকল প্রকার জুলুম ও শোষণকে দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য করেছে।

ইসলামী আইনের মূল লক্ষই মানুষের কল্যাণ। ইসলামী আইন তার বিশ্ব শাসনের এক হাজার বছরে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার আইন প্রণয়ন করেছে যেগুলো মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়েছে। মানুষের তৈরি আইন যেখানে মানুষের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়েছে ফলে পরবর্তীকালে আবার তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে। আমেরিকা একবার মানুষের জন্য ক্ষতিকর চিহ্নিত করে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু কিছুকাল গোপনে অত্যধিক প্রচলনের ফলে আবার তাকে বৈধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর মুকাবিলায় ইজতিহাদ ভিত্তিক ইসলামী আইনে এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। যেহেতু এ ইজতিহাদগুলো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক ক্যারিশমার ফল।

– আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ৯-২৪

ইসলামী আইনে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা

ড. মুহাম্মদ আবূ ইউছুফ

জীবন চলার জন্য প্রয়োজন সম্পদ। ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র, সকল ক্ষেত্রের সাফল্য নির্ভর করে সম্পদের ব্যবহারের ওপর। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ও নির্যাতিত জনতার গ্লানি দূরিকরণে সম্পদের ভূমিকাই মূখ্য। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। পুঁজিবাদী মতবাদে কারো উপার্জিত ধন-সম্পদের মালিক সেই ব্যক্তি, এতে অন্য কারো অংশ বা অধিকার নেই। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে - যাবতীয় ধন-সম্পদের মালিক সমাজ বা রাষ্ট্র , ব্যক্তির ইচ্ছামত এতে হস্তক্ষেপ এবং ব্যক্তিগত ভাবে এর মুনাফা গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই। এ দু'অর্থব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ায় তৃতীয় একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবী, আর এটিই হচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। The Islamic system is balanced and places everything in its right place. ইসলামী আইনে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালাগুলো প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

ইসলামী আইন

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য, ফলে তাদের এমন আইন বা বিধানের প্রয়োজন যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নির্ণয় করবে এবং অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দিবে। প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রণ করবে। এটিই হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল লক্ষ্য। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাকেই ইসলামী আইন বলে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত জন কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা হওয়ায় মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিক ভাবে। তাই ইসলামী আইনে এমন একটি আধ্যাত্মিক উপাদান রয়েছে যা মানব রচিত আইনে নেই। ইসলামী আইন আল্লাহর আনুগত্যের ইনসাফ পূর্ণ নির্দেশ। এতে ন্যূনতম যুলুমের স্থান নেই। মানব রচিত আইনে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন। মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এ পৃথিবীর জীবনে যার যত আইন প্রয়োজন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য ইসলাম সেই বিধান দিয়ে দিয়েছে। সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ে ইসলামী আইন অনুসরণ করা কল্যাণকর। The

---

লেখক : আলেম, ফকীহ, উপাধ্যক্ষ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

economic principle of Islam aim at establishing a just society wherein everyone will behave responsibly and honestly. কেননা, ইসলাম যেনতেন ভাবে সম্পদ অর্জন ও ব্যয় সমর্থন করে না।

সম্পদ অর্জন

ইসলামে সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ ছাড়া মানব কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। এ জন্যেই হালাল রুজির জন্য চেষ্টা চালানোর তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী চহিদা পূরণে নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য। ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনকে অভাবমুক্ত রাখা ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দান করেছে। ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতি ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। বৈধভাবে সম্পদ অর্জনে ইসলামে কোন বাধা নেই। সৃষ্টি জগতের সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহর নেয়ামত থেকে প্রজ্ঞা ও শ্রমের মাধ্যমে রুজি কামাই করে খেতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকলের অধিকার রয়েছে। জীবিকার জন্য যা অপরিহার্য তা সকলের জন্যই সমান। জীবিকার প্রয়োজন হতে বঞ্চিত থাকা ও কাউকে বঞ্চিত করা অন্যায়। এ পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করা, আয় উপার্জন করা এবং এ লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাকুরী করা স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন। সালাত শেষে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের সন্ধানে সম্পদ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- যখন সালাত শেষে হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল (রিযিক) অনুসন্ধান কর।[১] এবং দিবসের নিদর্শনকে আমি আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করতে পার।[২] এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় করেছি।[৩] আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।[৪] তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তার দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তার দেয়া আহার্য গ্রহণ কর। এবং পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।[৫] তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুসন্ধানে কোন দোষ নেই।[৬] তোমাদের সম্পদ যা- আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না।[৭] তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেও না।[৮] মহানবী (সা) বলেন- প্রতিটি মুসলমানদের জন্য বৈধ জীবিকা উপার্জন ফরয আদায়ের পর বাধ্যতামূলক।[৯] তিনি এ বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য বলেন- 'কোন ব্যক্তি তার নিজের প্রচেষ্টায় যা উপার্জন করে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।[১০] হযরত উমর রা. নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জনের প্রতি জোর দিয়েছেন। মানব মর্যাদার একটি অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই প্রয়োজন পূরণ করতে হবে, সে অনুসারে ফকীহগণ প্রত্যেক মানুষের তার নিজের ও তার পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে উপার্জন করাকে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব (ফরয আইন) আখ্যা দিয়েছেন। পরমুখাপেক্ষিতাকে নিরুৎসাহিত করতে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- যে হাত উপরে আছে তা নীচে পেতে রাখা হাতের চেয়ে উন্নত।[১১]

সম্পদ অর্জনের উপায়

সম্পদ অর্জনের উপায় হচ্ছে ৪টি। যথা কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও চাকরি। ইসলাম এ চারটি উপায় কাজে লাগানোর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছে।

১. কৃষি

সৃষ্টিকুলের খাদ্যের যোগান দেয় কৃষি। মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের কৃষি কাজের সুবিধার্থে পৃথিবীর মাটি ও ভূমিকে উৎপাদন ও ফসল ফলানোর উপাযোগী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য জমিকে করেছেন বিস্তৃত, যেন তোমরা তার উপর প্রশস্ত পথে চলাচল করতে পার।[১২] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র-

জমিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের জন্য বানিয়েছেন, তাতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর গাছ; যার ফল আবরন যুক্ত এবং দানাবিশিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল রয়েছে। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?।[১৩] কৃষি জমিকে উৎপাদনের উপযোগী করার নিমিত্ত মহান আল্লাহ বৃষ্টি প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পরে তার সাহায্যে সর্বপ্রকার উদ্ভিদ, গাছপালা উৎপাদন করি, পরে তাতে সবুজ শ্যামল তাজা পাতা ও শাখা-প্রশাখা বের করি- তা থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করি।'[১৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

মানুষের কর্তব্য তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া-চিন্তা করা। আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি, পরে আমি বিস্ময়করভাবে জমীন বিদীর্ণ করি। আর তাতে শস্য, আঙুর, শাক-সবজি, তরি-তরকারী, যয়তুন, খেজুর, বহুবৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি-খাদ্য উৎপাদন করি, তোমাদের ও তোমাদের পশুর ভোগের জন্য।[১৫] কৃষি উৎপাদন বাতাস ও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কেননা বাতাসের সাহায্যে মেঘমালা চলাচল করে এবং উদ্ভিদসমূহ ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে-

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং এতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেকটি জিনিস সুপরিকল্পিতভাবে ও পরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও, তাদের জন্যও। আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা একটা জ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, পরে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই, এর ভান্ডার-সঞ্চয় তোমাদের নিকট নেই।[১৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।[১৭] পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। এ আলো-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, তৃণভূমি-মরুভূমি সর্বত্র মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট জীবের জীবিকার অসীম উপকরণ রেখে দিয়েছেন- যার অংশ বিশেষও কিয়ামত পর্যন্ত নিঃশেষিত হবে না।

আর কালাম-ই পাকের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার সহজসাধ্য উপায়-উপকরণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যাতে মানুষ তা আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আর এ পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত যে ব্যক্তি বা জাতি নিয়মিত ও পরিমিতভাবে আহরণ করতে পারে, সে ব্যক্তি বা জাতি ততো সমৃদ্ধ হবে। শুধু যে সমৃদ্ধ হবে তা-ই নয়, এ কাজের জন্য সওয়াবও পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন-

যে মুসলমান কোন গাছ লাগায় বা ক্ষেত করে, আর তা থেকে পাখি বা মানুষ বা কোন প্রাণী যা খায়, তা তার জন্য দান হয়ে যায়।[১৮]

২. শিল্প

ইসলাম কৃষি কাজে উৎসাহ দিয়েছে। তবে সবাই এ কাজে মগ্ন থাকুক ইসলাম তা পছন্দ করে না। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ণ ও জাতীয় বিপদ-আপদের মোকাবেলা কেবল কৃষি দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্য কৃষি কাজের সাথে সাথে শিল্প উৎপাদনও জরুরী। এ আকাশ-বাতাস, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মাটি-বালি ও তার তলদেশে মহান আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদ সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার সদ্ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়ণের প্রয়োজন। শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না।[১৯] শিল্প কর্মের প্রতি পবিত্র কুরআনে ইংগিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- আর আমরা তাকে বর্ম তৈরী করার শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলাম যেন তা যুদ্ধে তোমাদের প্রতিরক্ষা করতে পারে, তাহলে তোমরা কি শোকর আদায় করবে না?[২০] হযরত সোলাইমান আ.-এর উঁচু উঁচু প্রাসাদ, বড় বড় পানি সঞ্চয় পাত্র এবং হযরত নূহ আ.-এর নৌকা তৈরীর বর্ণনা পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। যা দ্বারা নির্মাণ ও জাহাজ শিল্পের প্রতি নির্দেশনা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-এবং আমরা লৌহ সৃষ্টি করেছি, তাতে কঠিন শক্তি নিহিত রয়েছে এবং জনগনের অসীম কল্যাণ।[২১]

৩. ব্যবসা

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সম্মানজনক পেশা। জীবিকা অর্জনের এটি একটি অন্যতম উপায়। যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রয়েছে তারা এই পেশা অবলম্বন করে। যে জনপদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত রয়েছে সেই জনপদ ব্যবসা-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে অর্থাৎ ব্যবসা উপলক্ষে ও শীত কালীন ও গ্রীষ্মকালীন বিদেশ সফরে তাদের অভ্যাস রয়েছে, অতএব তাদের কর্তব্য এসবের প্রভু আল্লাহর ইবাদত করা, যিনি ক্ষুধায় তাদের খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন।[২২] আরো ইরশাদ হচ্ছে- কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে। এবং অপর কিছু লোক আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে।[২৩] ব্যবসায়ীরা সাধারণত উদ্বৃত্ত অঞ্চলের সামগ্রী ঘাটতি অঞ্চলে পৌছে দিয়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের অপচয় রোধ করে আর ঘাটতি অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করে মানব সমাজের যে সেবা করছে তা সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই নবী করীম সা.-সহ অধিকাংশ নবী-রসূল এবং হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ রা.-সহ বড় বড়

সাহাবী ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। এ ব্যাপারে নবী কারীম সা. বলেছেন-সৎ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গী হবে।[২৪] মহানবী সা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিনজনের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন কষ্টদায়ক আযাব। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে, যে মিথ্যা কসম করে তার পণ্য বিক্রয় করে।' (মুসলিম) মিথ্যা হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে এর প্রচলন সর্বাধিক। পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন অথবা পণ্যের গুণাগুন বাড়িয়ে বলার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় এবং কথায় কথায় মিথ্যা কসম খাওয়া হয়, যার ফলশ্রুতিতে ক্রেতাসাধারণ হন ক্ষতিগ্রস্ত। তাই আল্লাহর রসূল সা. ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এই ব্যাপারে উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে সতর্ক করে দিয়েছেন। ওজন ও পরিমাপে কম-বেশি করাও হারাম। ইরশাদ হচ্ছে-'ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।[২৫]

মজুদদারী এবং কালোবাজারী পরিহার করে চলতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ৪০ দিন পর্যন্ত আবদ্ধ রাখে, সে আল্লাহ থেকে মুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহর তার ব্যাপারে কোনো দায়দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা ও তার থেকে মুক্ত।[২৬] অপরদিকে যারা বাজার দরে দ্রব্য বিক্রি করে তাদের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এটাকে সদকা বা দান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-যে ব্যক্তি এক স্থান হতে খাদ্যশস্য ক্রয় করে অন্য স্থানে সেখানকার বাজার দরে বিক্রি করে, সে ব্যক্তি রিযিক প্রাপ্ত, আর গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।[২৭] ইসলামে ব্যবসানীতির মূল কথা হচ্ছে সামাজিক ও সামষ্টিক কল্যাণ। যে সব পথে উপার্জন বা মুনাফা লাভ করার ক্ষেত্রে অপরের ক্ষতি সাধিত হয়, তা ইসলামে বৈধ নয়। আর যে সব পন্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও অনুমতির ভিত্তিতে লাভ বন্টন হয় এবং সে বন্টন হয় সুবিচারপূর্ণ, তা অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। শুধু বৈধই নয়, তা ইবাদতও। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বাতিল পন্থায় একে অন্যের মাল ভোগ করবে না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যদি ব্যবসা করা হয়, তাহলে তা গ্রহণ করতে পারো। তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। যে লোক সীমালংঘন ও জুলুমস্বরূপ এ কাজ করবে তাকে আমরা অবশ্য জাহান্নামে পৌঁছে দেবো।[২৮]

৪. চাকরি

জীবিকা অর্জনের আরেকটি উপায় চাকরি। চাকরির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা ইসলামী আইনে বৈধ। তবে তাকে দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম হতে হবে। ইসলামে চাকরি লাভের অন্যতম শর্ত হচ্ছে যোগ্যতা অর্জন। যথাযথ যোগ্যতা অর্জন ছাড়া কোন পদের জন্য আবেদন করা ঠিক নয়। হারাম কাজ অথবা জনগনের ক্ষতিকারক কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। এ ক্ষেত্রে হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, তিনি বললেন-

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিবেন না! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর হাত আমার কাধের উপর রেখে বললেন, হে আবু যার! তুমি বড় দুর্বল ব্যক্তি (অথাৎ অত্যধিক সহানুভূতিশীল)। আর এ পদ হচ্ছে কঠিন আমানতের ব্যাপার। কিয়ামতের দিন

তা-ই হবে লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ, তবে যে লোক এ দায়িত্ব পূর্ণ যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার সাথে যথাযথ ভাবে পালন করবে তার বেলায় তা প্রযোজ্য নয়।[২৯] চাকরির ক্ষেত্রে ইসলামী আইন হচ্ছে উপযুক্ততা ও পরোপকারিতা। দক্ষ চাকরিজীবিগণ স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করবে এবং পরোপকারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

সম্পদ অর্জনের নীতিমালা

প্রবন্ধে সম্পদ অর্জনের চারটি উপায় যথাক্রমে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও চাকরী এ প্রত্যেকটির ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যায়, কিছু নীতিমালা সর্বক্ষেত্রে অনুসরন করতে হবে। এগুলো হচ্ছে উপার্জনের হালাল উপায়। Man needs bread to live but he does not live for bread alone.

ক. উপার্জন হালাল তথা শরী'আহ সম্মত হতে হবে।
খ. ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।
গ. বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হতে হবে।
ঘ. ধৈর্যশীলতা ও পরোপকারিতার মনোভাব থাকতে হবে।

উপার্জনের হারাম উপায়

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারাম বিবেচনা করতে হয়। এ অর্থনীতিতে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ বা হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী শরী'আহ নিষিদ্ধ কোন কিছুর স্বত্বার্জনই অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বলে গণ্য হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা অবৈধ ও বেআইনী। অবৈধ বা হারাম উপার্জন মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা বাহ্যিক প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা হলেও এর দ্বারা প্রকৃত সুখ ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায় না। যারা হারাম বা অবৈধ অর্থ-সম্পদের মোহে জীবন ব্যয় করবে তাদের পরকালীন জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে মহানবী সা. এরশাদ করেছেন-

যে দেহ হারাম উপার্জনে কেনা খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিন্ড জাহান্নামেরই যোগ্য।[৩০]

এছাড়াও সমাজে অর্থ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এমন আয় ও আয়ের পন্থাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিশ বা Invisible cost বা speed money. জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুন্ঠন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত,

ধাপপাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। এছাড়া অন্য কোন অসাধু উপায়ে অর্থনেতিক প্রাচুর্য গড়ে তোলা যেহেতু অন্যদের অধিকার কেড়ে নিয়ে ধনী হওয়ার নামান্তর, সে জন্য ইসলাম সাধারণভাবে তা নিষিদ্ধ করেছে। Islam strikes at the root of the evil and wants to establish a just and fair society.

সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা

ইসলামে মানব জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত বরং এটিকে প্রধান উপাদান হিসেবে গন্য করা হয়েছে। সম্পদ উপার্জনের নীতিমালা ইসলাম যেমন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে; তেমনি ব্যয়ের জন্যও রয়েছে সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতিমালা। ব্যয়ের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে 'ইনফাক'। প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় করাকেই 'ইনফাক' বলে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

লোকেরা আপনাকে কী ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে? আপনি বলুন যা ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথচারী মুসাফিরদের জন্য।[৩১]

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা থাকে। আল্লাহ যাকে চান এরূপ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৩২]

যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তিত হবে না।[৩৩]

শোন হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের অর্জিত উত্তম বস্তু থেকে এবং তা থেকে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই, এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না, কেননা তা তোমরা কখনো গ্রহণ করো না যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।[৩৪]

যারা নিজেদের ধন-দৌলত রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্য ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃচিন্তাগ্রস্ত হবে না।[৩৫]

যারা লোক দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না, শয়তান কারো সাথী হলে সে সাথী কত না মন্দ।[৩৬]

তারা ছোট কিংবা বড় যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ তার চাইতে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদের দিতে পারেন।[৩৭]

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের শাস্তির সংবাদ দিন।[৩৮] পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থ সম্পদ জমা করে রাখাকে ইসলাম পছন্দ করে না। বৈধ পন্থায় লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করাকে মহান রাব্বুল আলামীন পছন্দ করেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

বৈধ পন্থায় সম্পদ ব্যয়

উপার্জিত অর্থ বৈধ পন্থায় ব্যয় করা ইবাদত। বৈধ পন্থায় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে

১. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা।

২. স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করা।

৩. পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের জন্য ব্যয় করা।

৪. ফরয, ওয়াজিব ও নফল খাতসমূহে ব্যয় করা।

ফরয-ওয়াজিব-নফল খাতসমূহ		
ফরয	ওয়াজিব	নফল
যাকাত	সাদাকতুল ফিতর	সাদাকাতে নাফেলা
কাফফারা	নাফাকাত	ওয়াকফ
ফিদিয়া	নজর-মানত	ওয়াসিয়াত
মোহর	আকীকা	জারাইর [৩৯]
	কুরবানী	মিনাহ [৪০]

৫. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজে ব্যয় করা।

৬. অভাবী-দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা

৭. এরপরও সম্পদ থাকলে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তার সম্পদ ইসলামী মীরাসী আইন অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে। সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা তার জীবনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার ইনতিকালের পর সে সম্পদ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তার ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা দু' ভাগে ভাগ করা যায়

১. ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নীতিমালা।

২. ব্যয়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক নীতিমালা।

ইতিবাচক নীতিমালা

১. অল্পে তুষ্ট থাকা, এটি একটি ভাল গুণ। এতে ভোক্তার পছন্দ নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ থাকে। ভোগ বিলাসকে সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা পন্থা হিসেবে গণ্য করে।

২. সহজ সরল জীবন যাপন, এটি ইসলামী শরী'আহ্র একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সহজ সরল জীবন যাপন মনে আনন্দ দেয়। ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও অনৈতিক লাইফ স্টাইল ইসলাম অনুমোদন করে না। রসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে বলেছেন- তোমাদের বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ আমাকে অহীর মাধ্যমে অবগত করিয়েছেন, যাতে অন্যের প্রতি কোন অন্যায় সংঘটিত না হয় এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ না পায়।[৪১]

৩. মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক নীতিমালা

১. ইসরাফ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকেই ইসরাফ বলে। ইসরাফ অর্থ সীমা অতিক্রম করা, অপচয় করা। মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই অপচয় করছে। কাজ না করে সময়ের অপচয় করছে, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার না করে অপচয় করছে। পানাহারে বা ভোগবিলাসে অতিরিক্ত ব্যয়ের ভোগবাদী জীবনধারায় অপচয় শয়তানের অনুসরণ ফুটে উঠে।

সামাজিক পর্যায়ে ইসরাফ সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, বন্টননীতি এমনভাবে তৈরী হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইসরাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ইসরাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও ইসরাফ পরিহার করবে। ব্যয়ের ইসলামী নীতিতে তাই আদর্শ ও কাম্য।

২. তাবযীর বা অপব্যয় ঃ হালাল সম্পদ হারাম কাজে, অশ্লীল ও ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যয় করা তাবযীর। কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করলে, হারাম খাতে ব্যয় করলে ও অপব্যবহার করলে সেটাকে বলা হয় তাবযীর। ইসরাফের তুলনায় তাবযীরের ক্ষতি ব্যাপক। এজন্যই তাবযীরকারীদের শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।[৪২]

অবৈধ উপার্জন হতে অবৈধ খাতে ব্যয়ই শুধু নিষিদ্ধ নয়, হালাল উপার্জন হতেও অবৈধ খাতে ব্যয় নিষিদ্ধ। এজন্যই ইসলামে তাবযীরকারী বা অপব্যয়কারী নিন্দিত। অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। এজন্য অপব্যয় বা তাবযীর ইসলামী আইনে একটি অপরাধ।

৩. বুখল বা কৃপণতা ঃ সম্পদ উপযুক্তখাতে ব্যয় ও বিনিয়োগ না করা। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বন করা অত্যন্ত দোষণীয়। কৃপণতা মানুষের একটি মন্দ স্বভাব। ইসলামী জীবন বিধানে কৃপণতার কোন স্থান নেই। কৃপণতা ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর।

যাকাত ঃ ইসলামী আইনে যাকাত প্রদানের নীতিমালা

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনের ঘোষণায় যাকাত ফরয করা হয়েছে। কুরআনের বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধনীদের থেকে তা আদায় করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে যাকাতের অর্থ সাধারণ তহবিলে জমা না হয়ে আলাদা তহবিলে জমা হবে। এ তহবিল সরকারি খাতে একটি বাধ্যতামূলক তহবিল।

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা

যাকাত একটি ফরয ইবাদত। যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিধান। সঞ্চিত টাকা, সঞ্চিত মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী, শস্য, সোনা, রুপা, গবাদিপশু, যেমন-গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা প্রভৃতি নেসাব অনুযায়ী এক বছর যাবত অতিক্রান্ত হলে তার ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হয়। নিচে যাকাতের হারসমূহ প্রদত্ত হলো-

ক) সঞ্চিত টাকার যাকাত, প্রতি ১০০ টাকায় ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হয়।

খ) সোনার যাকাত, যদি ৭.৫০ (সাড়ে সাত) তোলা সোনা বছর যাবত কারো মালিকানাধীনে থাকে, তবে তাকে শতকারা ২.৫০ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

গ) রুপার যাকাত, যদি কারো মালিকানাধীনে ৫২.৫০ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা রুপা এক বছর যাবত থাকে তখন তাকে নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত দিতে হয়।

ঘ) উশর ঃ জমিতে উৎপাদিত ফসলের ১০% যাকাত হিসেবে প্রদান করাকে উশর বলে। এভাবে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গবাদি পশুরও যাকাত দিতে হয়। তবে যে জমিতে সেচ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় তার ৫% যাকাত দিতে হবে।

যাকাত হিসেবে আদায়কৃত অর্থ সরকারের সাধারণ তহবিলে নেয়া যায় না। যাকাত তহবিল নামে একটি বিশেষ তহবিলে এ অর্থ জমা করা হয়। এটি একটি বাধ্যতামূলক তহবিল যার আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত প্রদানকারী রাষ্ট্রীয় যাকাত তহবিলে যাকাতের অর্থ জমা দেবে আর ইসলামী রাষ্ট্র সে অর্থ আদায় করবে। 'নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর'।[৪৩] এ আয়াতে ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। কেউ যদি যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়, ইসলামী রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে জোরপূর্বক তা আদায় করে নেবে। রসূলুল্লাহ স.-এর ওফাতের পর কয়েকটি গোষ্ঠী যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত আবু বকর (রা) তাদের কাছে হুঁশিয়ার বাণী পাঠিয়ে বলেন, যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর। যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র, অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়। কেননা Zakah channels wealth from the rich to the poor while interest takes away wealth from the poor and hands it over to the rich.

যাকাত ব্যবস্থা বাংলাদেশে কতটুকু কার্যকর

যাকাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জাতি তা থেকে বঞ্চিত।

কারণ, যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক বাধা। বাধাসমূহ যেমন-

বাংলাদেশে ইসলামের মৌলিক যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে জোরদার আলোচনা কম হয়েছে যাকাত সে সবের অন্যতম। যাকাত সম্বন্ধে পত্র পত্রিকায় যদিও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে তবে তা যৎসামান্যই। আলেম সমাজ যদি জনগণকে যাকাতের হাকীকত ও ফযিলত সম্পর্কে যথাযথ বক্তব্য রাখতেন তবে এতদিনে যাকাতের উপযুক্ত ব্যবহার ও আদায় সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা লক্ষ্য করা যেত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও ব্যবহার হলে যে কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যেত্রে সে বিষয়েও জনগণের কোন ধারণা নেই।

সাহেবে নেসাবদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্য এদেশে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় আইন ও কার্যকর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গৃহীত না হওয়াই এজন্য প্রধানত দায়ী।

যারা যাকাত দিয়ে থাকেন তারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠান, ইয়াতিমখানায় ও ফকির মিসকিনকে তাদের যাকাত পৌছে দেন। বিপুল সংখ্যক যাকাত প্রদানকারী পুরুষ ও মহিলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মর্জি মাফিক তাদের প্রদেয় যাকাতের অর্থ বিলিবন্টন করে থাকেন। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন খুব সহজসাধ্য নয়।

সরকার যদি এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে তবুও জনগণের পক্ষ থেকে কাঙ্খিত সাড়া পাওয়া খুব সহজ হবে না। কারণ এদেশের সরকারের আর্থিক লেন-দেন ও অর্থব্যয়ের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের আচরণ, ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের প্রতি উদাসীনতার কারণে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি সন্দিহান। উপরিউক্ত সমস্যাবলির কারণে বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থা তেমন কার্যকর নেই বললেই চলে। তবে যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সরকারেরও তেমন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। কার্যকরী সরকারি পদক্ষেপ ছাড়া যাকাত ব্যবস্থার আর্থসামাজিক সুফল আশা করা যায় না।

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু যাকাত আদায় করার জন্য তাগিদ প্রদান করেননি বরং যাকাতের অর্থ বন্টনের খাতগুলোও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- অর্থাৎ, যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে।[৪৪]

ফকীর ঃ যাদের অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়, লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না তাদেরকে ফকীর বলে। যাকাত দিয়ে দরিদ্র, অভাবী, ফকীর শ্রেণীর পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। রসূলুল্লাহ স. বলেন, মুসলিম সমাজের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মিসকীন ঃ মিসকীন বলতে দৈহিক অক্ষম বিত্তহীন ব্যক্তিদের বুঝায়। যেমন- বিত্তহীন, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণীকে মিসকীন বলা হয়।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ঃ যারা যাকাত আদায় ও বন্টন করে এবং এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের বেতন-ভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

নও মুসলিমদের সংরক্ষণ ও মন আকৃষ্ট করা ঃ যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে নও মুসলিমদের ভরণ- পোষণ মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

দাসত্ব মোচন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে কোন ভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় করা যায়।

ঋণমুক্তি ঃ অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য ঋণ করে তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। তাদের ঋণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

আল্লাহর পথে (ফী সাবিলিল্লাহ)ঃ এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং এর ব্যাখ্যাও বিস্তৃত। সাধারণভাবে এটা জিহাদের অর্থ বুঝায়। আল-কুরআনুল কারীমে যত স্থানে জিহাদের কথা এসেছে সবখানে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়েছে। তবে আভিধানিক অর্থে একে জিহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সকল প্রকার কল্যাণময় ও নেক কাজকে এর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে একে কায়েম রাখার জন্য যেসব বিশাল কাজের আঞ্জাম দিতে হয় সেজন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত দল ও সংগঠন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মর্যাদা পেতে পারে; যদি তাদের নীতি, আদর্শ, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে কায়েম ও দীনের কালেমাকে সমুন্নত করণ। এক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধ প্রতিরোধ করার চেয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে দাওয়াতের কাজটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দাওয়াতের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় একটি বড় ক্ষেত্র। মূলত ইসলামী অনুশাসন যেখানে উপেক্ষিত, যেখানে ইসলামী আদর্শকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে ইসলামের সঠিক আদর্শ ও নীতিকে জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্য দাওয়াতী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন ফি সাবিলিল্লাহর অর্ন্তভুক্ত। যারা ইসলামের নীতি, আদর্শ ও বিধানকে যুগপোযোগী ভাষা, রীতি ও পদ্ধতিতে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে, জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শিক সাহিত্য রচনা এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণসমৃক কাজ করতে সক্ষম। এমনকি নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংসকারী ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিপরীতে আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত ইলেকট্রনিক মিডিয়া গঠন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী ও কথা প্রচারের কাজে প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

৮. মুসাফির (ইবনুস সাবীল) ঃ যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহের মধ্যে সর্বশেষ খাত হচ্ছে 'মুসাফির' পবিত্র কুরআনের ভাষায় এ খাতকে বলা হয়েছে ইবনুস সাবীল-এর অর্থ-পথে চলমান ব্যক্তি, ভ্রমণকারী বা পর্যটক। সফর বা ভ্রমণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন:

এক: আল্লাহ তা'আলার দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করা।

দুই: পড়ালেখার জন্য ভ্রমণ করা।

তিন: চাকরি বা জীবিকার্জনের জন্য ভ্রমন করা।

চার: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রহস্য অবলোকনের জন্য ভ্রমন করা।

ইবনুস সাবীলে উল্লিখিত সব দলই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য এক শহরে বা দেশে প্রবেশ করেছে যেখানে তার কোন সহায় সম্বল নেই। নিজের দেশে তার অনেক কিছু থাকলেও এখানে তা ব্যবহার করতে পারছে না; তাকেই ইবনুস সাবীল বা মুসাফির হিসাবে গণ্য করা হয়। সফরকালীন সময়ে তার রসদপত্র, খরচ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং তা সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে । তবে তার সফরটি শরীয়ত অনুমোদিত হতে হবে।

যাকাত আদায় বৃদ্ধি করার কৌশল

আমার মতে, নিচের সুপারিশমালার ভিত্তিতে যাকাত আদায় বৃদ্ধি করা যায়।

১. কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানে অস্বীকার করলে আইনের আওতায় এনে তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে।
২. রাষ্ট্রীয় ভাবে যাকাত বোর্ড/ ফান্ড গঠন করতে হবে এবং তার পেছনে প্রয়োজনীয় আইন ও জনবল থাকবে।
৩. যাকাত ঐচ্ছিক বিষয় নয়, একে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৪. প্রত্যেক মুসলমান যিনি 'মালিকে নেসাব' তাকে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে।
৫. প্রতিবছর মালিকে নেসাব ব্যক্তিদের তালিকা নবায়ন করতে হবে।
৬. যাকাত বন্টনের কাজটি রাষ্ট্র সমাধা করবে, ব্যক্তি নয়।
৭. মালিকে নেসাব নিজে হিসাব করে তার দেয় যাকাতের অর্থ সরকারি যাকাত তহবিলে জমা দেবে।
৮. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যাকাত প্রাপ্তদের ৮টি শ্রেণীর মধ্যে সরকার তা বন্টন করবে।
৯. ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত ব্যাংক থেকেই সংগ্রহ করার আইন কার্যকর করতে হবে।
১০. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে একথা বোঝাতে হবে যে, যাকাত করুণা নয়, বরং এটা সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য অবশ্য দেয় এবং গরীবদের ন্যায্য পাওনার বিষয়।
১১. বেসরকারী বিশ্বস্ত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান / সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ইসলামী আইনে সম্পদ অর্জন ও ব্যয় সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের বিবরণ

সূরা নং ও নাম	আয়াত নম্বর	সূরা নং ও নাম	আয়াত নম্বর
০২ আল-বাকারা	১৬৮,১৮৮,২৪৫,২৭৫,২৭৮,২৭৯.২৮০,২৮৩=০৮	৩৬ ইয়াসীন	৭১=০১
০৩ আলে-ইমরান	১৬১,১৮০=০২	৪২ আশ শুরা	১২=০১
০৪ আল-নেছা	০৫,০৬,০৭,১০,১১,১২,২৯,৩৬,১৭৬=১০	৫১ আয যারিয়াত	১৯=০১
০৫ আল-মায়েদা	৩৮,৫৫,৮৮=০৩	৫৭ আল-হাদীদ	২৭=০১
০৬ আল-আনআম	১৪১,১৪৫,১৬৫=০৩	৫৯ আল-হাশর	০৭,০৮,০৯,১০=০৪
০৭ আল-আ'রাফ	১০, ৩১,৩২=০৩	৬১ আস সাফ	১১=০১
০৮ আল-আনফাল	০২,০৩,০৪=০৩	৬২ আল জুমুআ	০৯=০১
০৯ আত তাওবা	৩৪,৬০, ১০৩=০৩	৬৭ আল-মূলক	১৫=০১
১১ হুদ	৮৭=০১ ৭০	আল-মা'আরেফ	২৪,২৫=০২
১৬ আন-নাহল	৭১,১১৪,১১৫,১১৬ =০৪	৭৩ আল মুযযাম্মেল	২০=০১
১৭ আল-ইসরা	২৬,২৭=০২	৭৬ আল-ইনসান	০৮,০৯=০২
২৪ আন নূর	১৯,২৩,২৭,৩৭=০৪	৮৩ আল-মুতাফফীন	০১,০২,০৩=০৩
২৫ আল-ফোরকান	৬৭=০১	৯৯ আয-যিলযাল	০৫=০১
২৮ আল-কাসাস	৫৮,৭৭=০২	১০২ আত তাকাছুর	০১,০২,০৩=০৩
৩১ লুকমান	২০=০১	১০৪ আল হুমাযাহ	০১,০২,০৩,০৪=০৪
৩৪ সাবা	৩৪, ৩৫=০২	মোট আয়াত সংখ্যা = ৭৯	

উপসংহার

ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। শরীয়তের আইন-কানূন ও বিধি- নিষেধের লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির জন্য সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। Islam encourages simplicity, modesty, charity, mutual help and co-operation. It discourages miserliness, greed, extravagance and unnecessary waste. এ জন্য মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের উভয় পর্যায়ের কল্যাণ কামনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দিন এবং আখেরাতের কল্যাণ দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।[৪৫] ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অর্থনীতিসহ জীবনের সকল দিকের নীতিমালা দিয়েছে। দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন। পরকালের জন্যও এর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামে সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল রুজির জন্য চেষ্টা চালানোর তাকিদ দিয়েছে ইসলাম। নিজের পরিবার ও সমাজের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালানো প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করে দিয়েছে ইসলাম। নীতিমালার ভিতরে থেকে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়কে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে। এ প্রবন্ধে ইসলামে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও কমিউনিষ্ট অর্থ ব্যবস্থার বিপরিত হচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা যা সার্বজনীন ব্যবস্থা। ইতো মধ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সুফল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রতিফল হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যদি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা বলতে কিছুই থাকবে না। কারণ আল্লাহ সকল প্রাণী সৃষ্টি করার পূর্বেই তার রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন- আল্লাহ বলেন-

প্রতি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর। এ ছাড়া প্রত্যেক ঈমানদারের অর্থব্যবস্থা অবশ্য ইসলামী আইনের আওতায় হবে। কেননা অর্থ সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পার্থিব জগতে পেশ করার সাথে সাথে পরকালে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হিসেব দেয়া ছাড়া এক কদম অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নেই। শরী'আ মোতাবেক সম্পদ অর্জন ও ব্যয় ইবাদত। গরীবকে আরো গরীব করা এবং ধনীকে আরো ধনী করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতি নয়। বরং গরীবকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দান করা এবং ধনীকে তার ধন আহরণ ও ব্যয় জুলুম ও শোষণমুক্ত ব্যবস্থার আওতাধীন রাখা ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর এ মহান ইবাদত পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র

০১. আল-কুরআনুল কারীম, ৬২ঃ সূরা আল জুমুয়া-১০
০২. ১৭ঃ সূরা বনী ইসরাইল-১২

০৩. ৭৮ঃ সূরা আন নাবা-১১
০৪. ৭ঃ সূরা আল আরাফ-১০
০৫. ৬৭ঃ সূরা আল মুলক- ১৫
০৬. ২ঃ সূরা আল বাকারা-১৯৮
০৭. ৪ঃ সূরা আন নিসা-০৫
০৮. ২৮ঃ সূরা আল কাসাস-৭৭
০৯. আল বাইহাকী, আস সুনান আল কুবরা, আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ ৬ , পৃ.১২৮।
১০. সুনান ইবনে মাজাহ, আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ. ৬ ,পৃ.৩৫৫, হাদীস নং ২১৩৯।
১১. সহীহ আল বুখারী, আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ. ৫ ,পৃ.২৪৮ , নং ১৩৩৮।
১২. নুহ- ১৯-২০
১৩. আর-রাহমান ১০-১৩
১৪. আনআম-৯৯
১৫. আবাসা ২৪-৩২
১৬. সূরা হিজর ১৯-২২
১৭. সূরা হুদ- ৬
১৮. বুখারী, আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ. ৮ ,পৃ.১১৮ ,নং ২১৫২.
১৯. ইসলামী অর্থনীতি, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, প্রঃ ২০০৪ অক্টোবর), পৃঃ ১৫৫
২০. সূরা আম্বিয়া- ৮০
২১. সূরা হাদীদ-২৫
২২. সূরা কুরাইশ-১-৪
২৩. সূরা মুয্যাম্মেল-২০
২৪. তিরমিযী , আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ. ৪,পৃ.৪১১ ,নং ১১৩০.
১৩. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আর-রাহমান-০৯
২৬. আহমাদ, মুসনাদ, আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ. ১০,পৃ.১৮৪ ,নং ৪৬৪৮.
২৭. ইবনে মাজাহ, সুনান, আল মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় এডিশন, খ. ৬,পৃ.৩৭৫ ,নং ২১৪৬.
২৮. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা নিসা- ২৯-৩০
২৯. মুসলিম, আস-সাহীহ, ইন্ডিয়া, আশরাফী বুক ডিপু, দেওবন্দ, খন্ড-২ পৃঃ- ১২১, নং ৩৪০৪।
৩০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, (ঢাকা: কাসেমিয়া লাইব্রেরী), বাবুল কাসবে ও তালাবিল হালাল, পৃঃ ২৪২।
৩১. সূরা আল বাকারা- ২১৫
৩২. সূরা আল-বাকারা- ২৬১
৩৩. ২ঃ সূরা আল বাকারা- ২৬২
৩৪. ২ঃ সূরা আল বাকারা- ২৬৭

৩৫. ২ঃ সূরা আল বাকারা- ২৭৪
৩৬. ৪ঃ সূরা আন নিসা- ৩৮
৩৭. ৯ঃ সূরা আত তাওবা- ১২১
৩৮. ৯ঃ সূরা তাওবা- ৩৪
৩৯. জারাইরঃ দরকার মত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই জারাইর। মহানবী স. এ ক্ষেত্রেও নিজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন এবং সকলকে উৎসাহিত করেছেন।
ড.হাসান জামান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (জুলাই ১৯৭৭) পৃ. ৪৬।
৪০. মিনাহঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ম্যাকানিজম হচ্ছে মিনাহ। এ ম্যাকানিজম উৎপাদনমূখী কোন সম্পদ অভাবী দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট
সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবী (সা) স্বয়ং এই ম্যাকানিজেমের শুভ সূচনা করেন। মদীনার সামর্থবান সাহাবারা মক্কা থেকে হিজরতকৃত মুহাজিরদেরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। মহাসবী সা.-এর হাদীস থেকে অর্থ, ভারবাহী পশু, দুধের পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ী এই ছয় ধরনের মিনাহ এর কথা জানা যায়। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, Islam, poverty and income Distribution, The islamic Foundation (1991) p 44
৪১. সুনানু আবি দাউদ, ২য় খন্ড, ১৯৫২ পৃষ্ঠা ৫৭২
৪২. ১৭ঃ সূরা বনী ইসরাঈল-২৭
৪৩. সূরা বাকারা-৪৩
৪৪. সূরা তাওবা- ৬০
৪৫. সূরা আল-বাকারা- ২০১

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারি-মার্চ ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ২৫-৩৬

ফিকহের উৎস

মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

ইসলামী ফিকহের উৎস

'উৎস' বলতে এমন উপায়-উপকরণ বুঝানো হয় যা থেকে আইন সংগ্রহ করা হয় অথবা এমন সব স্থানকে বোঝানো হয়, যেখানে থেকে দলিল সহকারে আইন লাভ করা হয়। যে শাস্ত্রে এই উপায়-উপকরণ ও স্থানসমূহের আলোচনা হয় তাকে বলা হয় 'উসূলে ফিক্হ'। ফকীহদের ভাষায় এর সংগা হচ্ছে ঃ

هو علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الا حكام الفقهية عن دلائلها-

'উসূলে ফিক্হ এমন কতিপয় মূলনীতির জ্ঞান যার মাধ্যমে যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে বিধি-বিধান উদ্ভাবন পদ্ধতির জ্ঞান লাভ করা যায়'।[১]

এ শাস্ত্রটি বিধি বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলীর কাজ করে। এটিকে জ্ঞানের একটি শাখা রূপে গ্রন্থায়ণ একমাত্র ইসলামেরই কৃতিত্ব। কিন্তু দীর্ঘকালীন অব্যবহার ও অনুশীলনের অভাবে এর পুনরগঠন ও পুনরবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; যাতে প্রগতিশীল মনন ও সমাজ ব্যবস্থাকে এর মাধ্যমে আত্মস্থ করা সম্ভব হয়।

আইনের কিতাবগুলোয় দুই ধরনের উৎসের বর্ণনা পাওয়া যায়:

(১) বিমূর্ত উৎস ও (২) মূর্ত উৎস।

এক. বিমূর্ত উৎস হচ্ছে আইনের এমন একটি উৎস যার মাধ্যমে সে তার বৈধতা ও প্রভাব অর্জন করে।

দুই. মূর্ত উৎস আইনের সেই সব উৎসকে বলা হয় যেগুলো থেকে আইন তার উপাদান লাভ করে।[২]

এভাবে একটির মাধ্যমে উপাদান ও উপকরণ সংগৃহিত হয় এবং অন্যটির মাধ্যমে আইনের ভূমিকা স্থান ও মর্যাদা নির্ণীত হয়। মুসলমানের জন্য ইসলামী ফিকাহর বিমূর্ত উৎসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভ করা। আর অমুসলিমের জন্য এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে, রাষ্ট্রের সন্তুষ্টি ও ইখতিয়ার লাভ করা-যেমন প্রত্যেক ধর্ম ও মিল্লাতের জন্য বৈশ্বিক ও দেশজ আইনের বিমূর্ত উৎসের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রের সন্তুষ্টি ও ইখতিয়ার লাভ করা।

লেখক ঃ পাকিস্তানের খ্যাতিমান গবেষক আলেম। ওআইসি'র কেন্দ্রীয় ফিকহ একাডেমীর সদস্য।

ইসলামী ফিকহের উৎস সংখ্যা

ইসলামী ফিকাহর উৎস(ماخذ) মোট বারটি

১. কুরআন

২. সুন্নাহ বা হাদীস

৩. ইজমা (اجماع বা ঐকমত্য)

৪. কিয়াস (قياس সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের বিধান উদ্ভাবন)

৫.ইসতিহসান (استحسان জনকল্যাণের বিধান উদ্ভাবন)

৬.ইসতিদলাল (استدلال) দলীলের আশ্রয় গ্রহণ

৭. ইসতিসলাহ (استصلاح) জনকল্যাণের বিবেচনা

৮. সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের মত (رأى)

৯. তাআমূল (تعامل) ব্যবহারিক প্রচলন

১০. উরফ (عرف) ও রসম (رسم) রেওয়াজ (رواج)

১১. পূর্ববর্তী শরীয়ত

১২. দেশজ আইন

উসূলে ফিকাহর কিতাবগুলোতে কেবলমাত্র প্রথম চারটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো উৎস অন্য কোনোটির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কেবলমাত্র চারটির উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয়েছে যার ফলে অন্যগুলো তাদের সাধারণ পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যেমন কিয়াসের আওতায় পড়ে সাধারণ পরিসরে ইসতিহসান, ইসতিদলাল ইত্যাদি। তেমনি ইজমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাআমূল ও রসম-রেওয়াজ। পূর্ববর্তী শরীয়তগুলো তাঁদের উৎস কুরআন ও সুন্নাতের পরিসরে দাখিল হয়ে যায়। দেশজ আইনও তাআমূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের রায় যদি কিয়াস ভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যথায় তা শ্রুতি নির্ভর হাদীসের আওতাধীনে এসে যাবে। ইসতিদলালও কিয়াসের নিকটবর্তী, যদিও তার অর্থ ও ভাবধারা কিয়াসের চাইতে বেশী ব্যাপক। প্রথম চারটি উৎসের মধ্যে স্তর ও মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। বরং আসল উৎস হচ্ছে একমাত্র কুরআন। সুন্নাহ তার ব্যাখ্যা এবং কর্মজীবনে বাস্তব রূপ দানের দৃষ্টিতে তার বিশ্লেষণেরই নাম। এ জন্যই সুন্নাতের কোনো কোনো ব্যাখ্যা সাময়িক ও স্থানীয়, আবার কোনো কোনোটি নীতিগত ও চিরন্তন। বিধান দানের ক্ষেত্রে উভয় বৈশিষ্টের বিবেচনা করা হয়।

রোমান ও আইনের উৎসের বিবরণ

এ প্রসংগে রোমান আইনের উৎসগুলোর আলোচনা আকর্ষণীয় হবে এবং এর মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত সম্ভব হতে পারে। উৎসগুলো হচ্ছে ঃ

১. দ্রে উধশধফণ টেযধরধটভ্র নামক গ্রন্থ যার মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় বিষয়সংক্রান্ত আইন লেখা ছিল। এই ধর্মীয় বিধানগুলোকেই ফাস (এট্র) বলা হয়।

২. ফকীহ ও মুজতাহিদগণের ফতওয়া। এই ফকীহগণকে আবার তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) প্রথম যুগের জ্ঞানী, আলেম (احبار) ও ফকীহবৃন্দ। তাঁরা বারোটি ফলক (কষণফশণ টঠফগ্র) -এ বিধৃত তথতি এর অন্তর্ভুক্ত আইনের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে নতুন বিধি-বিধান সম্বলিত একটি বিরাট সংকলন তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

(খ) পূর্ববর্তী ফকীহগণ। পরবর্তীগণের থেকে আলাদা করার জন্য এদেরকে পূর্ববর্তী বলা হয়। এদের নিম্নলিখিত কাজের ধরণ দেখে এদেরকে প্রায় উকিলদের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। যেমন–

এক. আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়া।

দুই. মামলার প্রাথমিক পর্যায়গুলোয় মক্কেলের স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষন করা।

তিন. আদালতে মামলার তদারক করা।

চার. কখনো কখনো এরা আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা সংকলন করতেন এবং কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় লিখিত ফতওয়াও দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ণিত দায়িত্বই এরা পালন করতেন।

৩. নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদগণ। এরা আইনের মূলনীতি রচনাকালের লোক ছিলেন। কাজটি শুরু হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে। এদের ওপর ছিল নিম্নলিখিত দায়িত্ব সমূহ ঃ

(ক) রোমান আইনের উন্নতি বিধান।

(খ) সংকলিত আইনের সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

(গ) আইনের আধুনিক ব্যাখ্যা দেয়া এবং অবস্থা অনুযায়ী তাকে নতুন কাঠামোয় ঢেলে সাজানো।

(ঘ) আইন প্রণয়ন সর্বোচ্চ পরিষদের কাজ। সম্রাট ও তাঁর বিশেষ পারিষদবর্গ এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ঙ) গণপরিষদ ঃ অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিবাসীদের জেলাওয়ারী বিভক্তির ভিত্তিতে এ পরিষদটি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(চ) নেতৃ পরিষদ (ওণভর্টণ)-এর কাজ। আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব সমূহ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পরিষদে পেশ করা হতো এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে সেগুলো জারী করা হতো। রোমের বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হতো। রাজা নির্বাচন করা ও তাঁকে পরামর্শ দেয়া ছিল এর কাজ। পরে এই পরিষদ রাজার কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে।

(ছ) রাজকীয় ফরমানগুলো রক্ষণ।

(জ) ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্দেশাবলীর সংকলন।

(ঝ) রসম ও রেওয়াজ সংগ্রহ। এটি হচ্ছে আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস। প্রত্যেক যুগে এর অস্তিত্ব ছিল।[৪]

রোমীয় আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, এর একটি অংশ ধর্মভিত্তিক। এভাবে ধর্মীয় আইনের অংশসমূহ অনিবার্যভাবে সামগ্রিক আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এবার আমরা ইসলামী ফিকহের প্রত্যেকটি উৎসের বিশদ আলোচনা করবো।

প্রথম উৎস কুরআন হাকীম

ইসলামী ফিকহের মূল উৎস (مـاخـذ) ঃ কুরআন হচ্ছে ইসলামী ফিকহের মূল উৎস। মূলনীতি (اصـول) ব্যাপক নীতি (كـلـيـات) সমূহ এই কিতাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর কর্মনীতি, কর্মকৌশল ও বিধান (ডমর্ত্ত্বর্ধর্লধমভ) এই কিতাবের আলোচ্য বিষয়। বিধানগুলোর শাখা-প্রশাখার (جـزئـيـات)-অর্থাৎ আইনের খুটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এখানে খুব কমই করা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লামা শাতিবী র. বলেন ঃ

القـران علـى اخـتـصـاره جـامـع ولايكـون جـامـعـا الا والـمـجـمـوع فـيـه امـوركـلـيـات

'কুরআন মজীদ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক (جـامـع) তথা একটি পূর্ণাংগ কিতাব। আর এ ব্যাপকতা বা পূর্ণাংগতা তখনই সম্ভব যখন তার মধ্যে থাকে কেবল সমস্ত মৌলিক বিষয়ের সমাহার।"[৫/১]

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন :"কুরআন হাকীমে শরীয়তের বিধান সমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেখানে কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে তা কোনো মৌলিক বিষয়ের অধীনেই করা হয়েছে।"[৫/২]

কুরআন মাজীদ যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াতের সর্বশেষ সংস্করণ এবং এরপর আর কোন নবী আসবে না, কোন কিতাবও নাযিল হবে না তাই প্রতি যুগে এর শিক্ষা ও নীতিমালার প্রয়োগের উপযোগিতা অপরিহার্য। এটা সম্ভবপর হয় যদি মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দী নির্ধারণের পর তার সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়। পাথর ফলক প্রোথিত করে বসিয়ে দেয়া হয় এবং মানব জীবনের এই মানচিত্রে রং চড়ানোর দায়িত্ব সোপর্দ করা হয় বিভিন্ন কালের উলামার ওপর, যাঁরা তা করবেন অবস্থা ও কালের চাহিদার প্রেক্ষিতে। বাস্তবে তাই হয়েছে। কুরআনী মূলনীতি ও মৌলিক বিধানাবলী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু তাঁদের ইজতিহাদ প্রসৃত শাখা-প্রশাখায় পরিবর্তনশীল সমাজের সমাধানের তাগিদে পরিবর্তন আসতে পারে। এর বিপরীতে যদি শুরুতেই খুঁটিনাটি বিষয়াদির আবতারনা করা হতো, তাহলে প্রথমত কুরআনের গঠনতান্ত্রিক (constitutional) রূপটি বিনষ্ট হতো এবং দ্বিতীয়ত যদি ধরা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রবর্তিত কুরআনের মৌলনীতি ও বিধানগুলোকে এমন ভাবে সম্প্রসারিত করে দিলেন যাতে সর্বকালের সব সমস্যার সমাধান মিলে, আল্লাহর পক্ষে তা অসাধ্য কিছু নয়, কিন্তু বান্দার পক্ষে সে অতিবিশালকায় কুরআন শেখা এবং ইঙ্গিত বিধান খুঁজে বার করা সম্ভব হত কি? অন্যদিকে যদি কয়েকটি যুগের প্রয়োজন মত

সম্প্রসারণ করে দিতেন তাহলে কুরআন অপূর্ণ থেকে যেতো। আল্লাহ তাঁর সেরাসৃষ্টি মানুষকে বিচার বুদ্ধি এবং বিবেক সম্পন্ন করে তৈরী করেছেন। যদি মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত মৌলনীতি ও ব্যাপক (كلى) বিধানগুলোর প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারা-উপধারা প্রণয়ন করতে না পারে, তা হলে তাঁর এই সেরাসৃষ্টির সার্থকতা কোথায়?

কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত কর্মকৌশল ও মূলনীতির কিতাব

কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ যথা: কুরআন সরকারের প্রকৃতি ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর রূপ হবে খিলাফতের অর্থাৎ জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব এবং আমানতদারীর রূপ। মানুষের ঐক্য এবং সাক্ষ্যই হবে এর ভিত্তি। ইনসাফের মাধ্যমে সরকার মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করবে। একথাও বলে দিয়েছে যে, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের মধ্যমণি হবে শূরা (شورى) যাকে পার্লামেন্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু শূরার প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে তা বলে দেয়নি। সরকার প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক হবে, না একনায়কত্বমূলক রাজতান্ত্রিক, না সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক? এ সব কথার ফায়সলা দেয়া হয়নি। জনগণের মতামত জানার জন্য কোন ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তাও মানুষের সৎ বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন বলে দিয়েছে, সব সম্পদের মালিক আল্লাহ, ধনীর ধনে বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ধন বন্টনের এবং বঞ্চিতের অধিকার আদায়ের, অধিকন্তু জনগণের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন তার রূপরেখা কুরআন নির্ধারণ করে দেয়নি। মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তি তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে বায়তুল মাল, আদালত ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে, অবশ্য ইজতিহাদে শামিল ছিল পরিস্থিতি ও সময়ের বিবেচনা।

কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে যে ধরণের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং যে ধরনের সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করে কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জন করা যায় তাকে কুরআনী হুকুমাত বা কুরআনী সরকার বলা হবে। আধুনিক বিশ্ব তাকে গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার যাই বলুক এবং জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এ সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক অথবা অন্যকোনো ভাবে, তাতে কিছু আসে যায় না।

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ 'জুযইয়াত' (جزئيات)-এর গবেষণা বা ইজতিহাদের মাধ্যমে যে বিরাট কার্য সম্পাদন করেছেন, তা সবই ছিল তাঁদের নিজেদের যুগ ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আজো আমরাও মূল লক্ষের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী ফকীহদের রচিত বিধি-বিধানের আলোকে নিজেদের যুগের অবস্থা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও বিধান রচনা করতে পারি কিংবা পূর্ববর্তীদের বিধি-বিধানের অনুসরণ করতে পারি। আমাদের রচিত বিধি-বিধান কিংবা আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক কাঠামো তাও চূড়ান্ত ও চিরন্তন হবে না। বরং নির্ভরশীল হবে সময় ও সমাজের অবস্থার ওপর এবং টিকে থাকবে সময়ও সমাজ যতদিন অনুমতি দেবে ততদিন। কিন্তু মৌলনীতি ও বিধানগুলো চিরন্তন।

আসলে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ নির্ভর করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গণ-চেতনার ওপর। কোনো দেশের অনুকরণের ওপর নয়। তাই যখন গণ-চেতনায় পরিবর্তন আসবে তখন অনিবার্যভাবে পুরাতন কর্মপদ্ধতির পুনরবিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেবে।

ফকীহের জন্য কুরআনের সাথে সম্পর্কিত উসূলে ফিকহের ব্যাখ্যা জানা অপরিহার্য

কুরআনের যেসব অংশের সাথে ফিকহী বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, ফকীহগণ সেইসব অংশের আলোচনা করেছেন। এ সব অংশে প্রায় পাঁচশতের মত আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কথাগুলো জানা জরুরী ঃ

১. নাসেখ ناسخ -যে আয়াত অপর কোন আয়াতের বিধানকে মওকূফ করে দেয়। ও মানসূখ منسوخ-যে আয়াতের বিধান মওকূফ হয়ে গেছে।

২. মুজমাল مجمل অর্থাৎ যে আয়াতের বিধান সংক্ষিপ্ত এবং মুফাসসার مفسر অর্থাৎ যে আয়াত সংক্ষিপ্ত নয়; বরং ব্যাখ্যা সম্বলিত।

৩. আম عام ব্যাপক অর্থবোধক এবং খাস خاص বিশেষ অর্থবোধক ।

৪. মুহকাম محكم-যে সব আয়াত কর্ম জীবনের বুনিয়াদ স্বরূপ এবং বোধগম্য, আর মুতাশাবীহ متشابه অর্থাৎ ঈমানী বিষয়গুলোর এবং সাথে সম্পর্কিত আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যমূলক বিধানের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং সহজবোধ্য ও নয়।

৫. যে সব আয়াতে মানুষের কর্মের কথা রয়েছে, ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, সে সব কর্মের আদেশগুলো কোন পর্যায়ে ফরয? ওয়াজিব? সুন্নাত? মুস্তাহাব? এবং নিষেধগুলো কোন পর্যায়ের? হারাম? মাকরূহ? ইত্যাদি।

ফকীহগণ এগুলো ছাড়া আরো বহু ব্যাপার বিশ্লেষণ করেছেন, প্রমাণ, প্রয়োগ এবং বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। সেগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ফকীহ ও মুজতাহিদের জন্য সেগুলোর জ্ঞান অর্জন জরুরী।

উসূলে ফিকাহর কিতাবগুলোয় ফকীহগণের বর্ণনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। এখানে আমি কেবল কতিপয় বুনিয়াদী বিষয়ের আলোচনা করেই ক্ষান্ত হবো। এ বিষয়গুলো ফকীহদের দৃষ্টিতে ছিল এবং কয়েকটি মৌলিক কথা ফিকাহর বিন্যাসের সময় তাঁরা এগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য গণ্য করেছিলেন।

কুরআনের আয়াতের আকারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ ও পরিচ্ছন্ন বিষয় অবতীর্ণ হয়েছিল, দীনের পরিপূর্ণতার পর্যায়ে তা যতই নতুন বিধানরূপে প্রেরিত হোক না কেন, মৌলিক শিক্ষার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে এমন একটিও ছিল না যা পৃথিবীবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রেক্ষিতে কুরআন নাযিলের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো প্রতিভাত হয়ঃ

১. পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারের পর আল্লাহর হেদায়াতের যে অংশ বাকি ছিল তা পূর্ণ করা।

২. যে অংশ বাড়ানো বা কমানো হয়েছিল তাকে সুস্পষ্ট করা।

৩. যে অংশ বিস্মৃত করা হয়েছিল তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৪. ভুল ক্রমে মানুষ যেসব বাঁধনে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছিল সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া।

উপরোল্লেখিত বর্ণনার সমর্থনে কুরআন মজীদের সূরা اعراف-এর ১৫৭ নং আয়াতের কয়েকটি কথা অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ

١- يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ-

তিনি (রসূল স.) লোকদের মারুফ তথা সৎ কাজের হুকুম দেন।

٢- يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তিনি তাঁদেরকে মুনকার তথা অপকর্ম থেকে বিরত রাখেন।

٣- يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ-

তিনি পাক-পবিত্র বস্তুগুলো তাঁদের জন্য হালাল করেন।

٤- يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ-

অপবিত্র বস্তুগুলো তিনি তাঁদের জন্য হারাম করে দেন।

٥- يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ-

তিনি তাঁদের বোঝা নামিয়ে বা লাঘব করে দেন।

٦- وَالاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ-

যেসব শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল তিনি সেগুলো সরিয়ে দেন।

মারুফ ও মুনকারের ব্যাখ্যা

'মারুফ' বলতে বুঝায় জানা ও পরিচিত বস্তু বা বিষয়। আর 'মুনকার' হচ্ছে অপরিচিত এবং দোষাবহ বলে অস্বীকার করা হয়েছে এমন বিষয়। আল্লাহর হেদায়াতের প্রদীপ অনবরত প্রদীপ্ত থাকার কারণে ইতিহাসের প্রতি যুগে নৈতিক মূল্যবোধের ধারা অনেকাংশে সজীব থেকেছে এবং নৈতিক চরিত্র বিনাশী বস্তু-বিষয়ের সাথেও অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা পরিচিত থেকেছে। এ কথা স্বতন্ত্র যে মানুষ স্বার্থ ও লালসার প্রাধান্যের কারণে মারুফ ছেড়ে মুনকার কর্মে লিপ্ত হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আসলের গায়ে নকলের আবরণ লেপ্টে গেছে। তাই বলে ন্যায়সম্মত বিষয়ের পরিচয় কখনও সাকুল্যে ঘুচে যায়নি।

এ প্রসংগে আরবের অবস্থা বেশী উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ব্যাপারে এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে তারা নৈতিকতার গুরুত্ব ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত থেকেছে? এই দুই নবীর নির্দেশিত কতগুলো কর্ম এবং কতক নৈতিক ধ্যান ধারণা আরবদের সমাজে প্রচলিত ছিল যদিও তার ওপর শিরক এবং কুসংস্কারের প্রলেপ পড়েছিল।

উল্লেখিত মারুফ বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝা যাবে।

১. সেই সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী যেগুলো আরবের অথবা দুনিয়ার যে কোনো অংশে বিরাজিত ছিল।

২. আসমানী শরীয়তের এমন অনেক বিষয় যেগুলা লুপ্ত হয়নি এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের হিকমতের সাথে সাম স্যশীল ছিল।

৩. রসম রেওয়াজ ও এমন সব দেশজ আইন যেগুলো ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি ও সুস্থ বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। অনুরূপভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিপরীতধর্মী অথবা তার বিরোধী যাবতীয় ব্যাপার মুনকার-এর অন্তর্ভুক্ত। আবু বকর জাসসাস 'মারূফ' শব্দের সংগা নিদের্শ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

والمعروف ماحسنه الشرع والعقل

'শরীয়ত ও বুদ্ধি যাকে সুন্দর ও ভালো বলে অভিহিত করে সেটিই হচ্ছে মারুফ।'[৬]

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

والمعروف هو ماحسن فى العقل فعله ولم يكن منكرا عن زوى العقول الصحية

'সুবুদ্ধি যেটা করা পছন্দ করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীদের দৃষ্টিতে যেটা মুনকারের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটিই হচ্ছে মারূফ।'[৭]

উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক যুগের রসম রেওয়াজ, দেশীয় আইন ইত্যাদি, সুবুদ্ধি ও শরীয়তের বিরোধী নয়, সেগুলোকে মারূফের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে। কুরআনের এই পরিভাষাগত শব্দ معروف অত্যন্ত ব্যাপক এবং এতে দেশজ আইন ও উত্তম রেওয়াজাদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

ইমাম আবু বকর রাযী র. -এর কথা

كلمة جامعة لجميع جهات الامر بالمعروف

অর্থাৎ এ শব্দটি আমর বিল মারূফের সকল বিভাগের জন্য ব্যাপক।[৮] এছাড়া এটি আল্লাহর কর্মনীতিকে অক্ষুন্ন রেখে মানুষের দেশীয় ও জাতীয় সকল প্রকার স্বার্থ ও কল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপকতাকে সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

التعظيم لامرالله والشفقة على خلق الله

আমার বিল মারূফের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহর হুকুমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ।[৯]

এই সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ বাণীর অন্তরনিহিত অর্থ সরকারী ও আইনগত পর্যায়ে একটি ব্যাপক অধ্যায় সৃষ্টি করে।

তাইয়েবাত ও খাবায়েস

তাইয়েবাত ঃ طيبات পাক-পরিচ্ছন্ন বস্তু বা বিষয় সমূহ ও 'খাবায়েস' خبائث ঃ অপবিত্র-অপরিচ্ছন বস্তু বা বিষয় সমূহ। এ শব্দ দুটোও মুফাসসিরগণের মতে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :-

المراد من الطيبات الاشياء المستطابة بحسب الطبع

"সুস্থ প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষ যে সমস্ত জিনিসকে পাক-পরিচ্ছন্ন মনে করে সেগুলোই হচ্ছে তাইয়েব।"[১০]

তদ্রুপ খাবায়েস সম্পর্কেও বলা হয়েছে :

كل مايستخبثه الطبع ويستقذره النفس كان تناله سببا لالم

"সুস্থ প্রকৃতির মানুষ যেসব জিনিসকে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন মনে করে এবং প্রকৃতিস্থ হৃদয় যাকে নাপাক মনে করে এবং যা গ্রহণ করা কষ্টের কারণ হয় সেগুলো হচ্ছে খাবায়েসের অন্তর্ভুক্ত। ১১

উপরোক্ত বক্তব্যের ইংগিত ঃ লক্ষণীয় বিষয়, বিকৃতির চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল এমন এক সমাজকে সম্বোধন করে মারুফ ও মুনকার এবং তাইয়েবাত ও খাবায়েস ইত্যাদি সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছিল। জীবন তাঁদের পাপে পরিপূর্ণ হলেও সে সমাজে যদি মৌলিক মূল্যবোধের ধারণা আদৌ না থাকতো তাহলে এ ধরনের বক্তব্যে সেখানে আরো বেশী গোমরাহী ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ঠিকই তবুও একেবারে অজ্ঞ, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য ইত্যাদির ধারণা বিবর্জিত একটি মানব সমাজকে সম্বোধন করার জন্য উল্লেখিত পরিভাষাগত শব্দের ব্যবহারের কোন সার্থকতা থাকতো না। তাঁদের মধ্যেও সুস্থ-প্রকৃতি এবং عقل سليم-তথা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী কিছু সংখ্যক লোক বিদ্যমান ছিল এবং সেই সমাজে মারুফ ও মুনকার এবং তাইয়েবাত ও খাবায়েসের মানদন্ড একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই সে সমাজের কতিপয় বিধি-বিধান, রসম ও রেওয়াজ কল্যাণকর হিসেবে ফিকাহ ইসলামীতে স্থান লাভ করেছিল।

বোঝা ও শিকলের ব্যাখ্যা

اصل এবং غلال শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে এমন সব বিধান ও কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঠিন্য এবং যেগুলো অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য। ১২ মওলানা আবুল কালাম আযাদ যে আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ:

এই 'বোঝা' কি ছিল? এই 'ফাঁদ' (শিকল) কি ছিল? কুরআন এ থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে? অন্যত্র কুরআন এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। ধর্মীয় বিধানের অযথা কড়াকড়ি ধর্মীয় জীবনের এমন সব বিধি-নিষেধ যেগুলোর কার্যকর পালন সম্ভব নয়। দুর্বোধ্য 'আকীদা' বিশ্বাসের বোঝা, কুসংস্কারের স্তূপ, 'আলেম ও ফকীহের অন্ধ অনুকরণের বেড়ী, নেতাদের দাসত্বের শিকল-এগুলোই হচ্ছে সেই اصل এবং غلال। ইয়াহুদী ও 'ঈসায়ীদের মন-মস্তিষ্ককে যা কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। ইসলামের নবী স. এর দাওয়াত তাঁদেরকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি তাদের এমন সহজ সত্য পথ দেখিয়েছেন, যে পথে বুদ্ধির ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না, আমল বা কাজের ক্ষেত্রেও কোনো অযথা কড়াকড়ি করা হয় না। ১৩

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ র.-এর বক্তব্য

উপরে কুরআন নাযিলের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য তার সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে ঃ

انه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنفية الابراهيمية (التى شاعت فى العرب) لاقامة عوجها وازالة تحريفها واشاعة نورها

وذلك قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم-ولما كان الامر على ذلك وجب ان تكون تلك الاصول مسلمة وسننها مقررة لان النبى اذابعث الى قوم فيهم بقية سنة فلامعنى لتغييرهاوتبديلها بل الواجب تقريرها لانه اطوع لنفوسهم واثبت عند الاحتجاج عليهم-

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল সরল-সোজা ইবরাহীমী মিল্লাত দিয়ে (যা আরবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল) মিল্লাতের বক্রতাকে সোজা করার জন্য, তার বিকৃতি দূর করার জন্য, তার আলো বিকীরণের জন্য। এটিই আল্লাহর বাণীতে মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীম–বাক্যটির অর্থ। এই যখন অবস্থা ছিল তখন নিশ্চয়ই মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলনীতিগুলো স্বীকৃত ছিল এবং তার সুন্নতগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ পয়গম্বর যখন এমন কোনো জাতির মধ্যে আগমন করেন, যাদের মধ্যে আগের শরীয়তের কিছু সুন্নত অবশিষ্ট থাকে, যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তনের কোনো অর্থ হয় না, বরং কর্তব্য হলো সে সুন্নত গুলোকে কায়েম রাখা কারণ ঐ গুলো সে সমাজের জন্য অধিকতর সুখকর এবং প্রমাণ প্রয়োগের পক্ষে অধিকতর মজবুত হয়।[১৪]

আলোচনা প্রসংগে তিনি আরো বলেছেন : "জাহেলী যুগে এমন লোক একেবারে বিরল ছিল না (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে) যারা নবীদের আগমনের বৈধতা এবং নবীদের আগমনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতো। তারা কিয়ামতে আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তির সম্ভাব্যতা মানতো। নেকী ও কল্যাণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে লোকেদের সাথে লেন দেন করতো। তবে তাঁদের মধ্যে দুটি দলের উদ্ভব হয়েছিল। একদল ছিল ফাসেক এবং অন্য দলটি ছিল যিন্দীক যারা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলিমদের ক্ষতি এবং তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো। ফাসেকদের ওপর পাশব প্রবৃত্তি ও বর্বরতার প্রাধান্য ছিল। আর অন্যদিকে যিন্দীকদের চিন্তা ও মনন এবং মানসিক জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।[১৫]

হযরত শাহ সাহেব অন্যত্র বলেছেন :

"অনেক সময় এই নবী তাঁর দাবীগুলোর সমর্থনে দলীল পেশ করতেন পূর্ববর্তী শরীয়তের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার মাধ্যমে।"[১৬]

এ কারণেই কুরআন মজীদে বিভিন্ন নবীর সম্বন্ধে আলোচনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও তাঁদের অনুসৃতির হুকুম দেয়া হয়েছে, যথা :

فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ "তুমি তাঁদের হেদায়াতের অনুসরণ করো।"

মোটকথা এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত হিকমত ও মূলনীতির ভিত্তিতে পূর্ববর্তী শরীয়তের নীতিমালা এবং নতুন বিধি-বিধানের সমন্বয়ে অবস্থা ও যুগের উপযোগী একটি পূর্ণাংগ শরীয়ত প্রকাশ করেন।

কুরআন নাযিলের সামাজিক পটভূমি

সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিলকৃত কুরআনের বিধান সমূহকে দুটো বড় বিভাগে বিভক্ত করা যায় :-

এক : রসূলুল্লাহ স.-এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াত এবং আহকাম প্রথম বিভাগে পড়ে। ছোট্ট মুসলিম জমায়াতটি সবেমাত্র প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল। তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা তখনো সম্যক জাগ্রত হয়নি। অন্যপক্ষে ইসলামের প্রচারে পর্বত প্রমাণ বাধা। এ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল এমন কতিপয় মৌলিক আকীদা ও আমলের প্রচার. যা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐক্য ও এককেন্দ্রীকতা সৃষ্টি করতে পারে, নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উন্মেষ ঘটাতে পারে। তাছাড়া জরুরী ছিল কিছু প্রায় সর্বজন বিদিত ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা, যা থেকে লোকেরা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত হয় এবং কুসংস্কারের জাল থেকে বেরিয়ে যথার্থ সত্যকে অনুধাবন করতে পারে।

সুতরাং এই প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদের যে সব সূরা নাযিল হয় তাতে ছিল তওহীদ, রিসালাত, কর্মফল, নৈতিক গুণাবলী, অতীত জাতি সমূহের উত্থান পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিকাহিনী, আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও সৃষ্টিকৌশল, ধর্মীয় শিক্ষার প্রাণশক্তি এবং আল্লাহর সবিস্তার বর্ণনা এবং কিছু চারিত্রিক নির্দেশাবলী, সৃষ্টি কৌশলের অন্তরনিহিত বাণী থেকে তাঁদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণাম ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনাও থাকে। মোটকথা এ পর্যায়ে অবতীর্ণ কুরআনের সূরাগুলোতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তা অনেকাংশে জাতির কাছে স্বীকৃত ছিল এবং তার গুরুত্ব, ফায়দা ও প্রকৃত তাৎপর্য অস্বীকার করা তাদের জন্য ছিল বড়ই কঠিন।

জাতীয় ও সমাজবদ্ধ জীবনে এই প্রাথমিক পর্যায় সবচেয়ে বেশী নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এ পর্যায়ের যথাযথ সংগঠনের ওপরই জাতির সাফল্য ও উন্নতি নির্ভর করে। আর এর মধ্যে সামান্যতম ভুল ভ্রান্তির পরিণাম ভোগ করতে হয় চিরকাল। কুরআন মজীদের ৩০ ভাগের প্রায় ১৯ ভাগই এই মক্কী যুগে নাযিল হয় এবং সেগুলো পূর্বোক্ত কয়েকটি বিষয়ে ছিল সীমাবদ্ধ। এই অংশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত সমৃদ্ধ, সূরাগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণভাবে এখান يـا يـها الـنـاس-(হে মানব জাতি) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

দুই : দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে রসূল স.-এর মাদানী জীবনে অবতীর্ণ সূরাগুলো। হিজরতের সময় পর্যন্ত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে পরিবেশ পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন ও সুগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। হক حـق ও বাতিলের بـاطـل মধ্যে পার্থক্য করার প্রবণতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সত্যানুসারীদের জন্য একটি পূর্ণাংগ সংগঠন কায়েম করার। এর জন্য জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত মৌলিক হেদায়াতের প্রয়োজন হল। তাই কুরআনের এই অংশে সাধারণত এই বিষয়গুলোই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিবৃত হয়েছে এবং সেখানে সম্বোধন করা হয়েছে يـا يـهـا الـذيـن امـنـو বলে। এটিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের মাদানী যুগ বলা হয়। এই যুগের সূরাগুলোর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও বিস্তারিত হেদায়াত সম্বলিত। এভাবে কুরআন মজীদ ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। ১৩ বছর মক্কী যুগ এবং ১০ বছর মাদানী যুগ।

উভয় যুগের বিধান ও নির্দেশনামায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

উভয় যুগের বিধান ও মূল নির্দেশনামা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করা জরুরী।

১. মৌলিক ও সাধারণ বিধানের ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির কোন কোন দিকের সুবিধা বিবেচনা করা হয়েছে।

২. আয়াত নাযিলের পটভূমি কি এবং কোন কারণ তার পেছনে কার্যকর ছিল।

৩. আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থার কতটা বিবেচনা করা হয়েছে এবং সামাজিক বিবর্তনের ধারায় কোন আইন কয়টি সোপান অতিক্রম করেছে।

৪. একটি নির্দেশের পরে সমপর্যায়ের আর একটি নির্দেশ কিসের ভিত্তিতে এসেছে?

৫. বিধানের মধ্যে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের মতো কোন কোন হিকমত কারণ নিহিত রয়েছে ?

৬. মৌলিক اصول ও ব্যাপক ও পূর্ণাংগ নীতি كليات সমূহের মধ্যে কোন ধরনের প্রাণসত্তা روح সক্রিয় রয়েছে এবং তাঁরা কোন ধরনের স্বভাব প্রকৃতির সন্ধান দেয়?

৭. আইনের শাখা-প্রশাখা جزئيات কোন প্রাণ সত্তার শক্তির প্রকাশ এবং সেগুলোর ওপর সামাজিক রীতি-রেওয়াজের প্রভাব কতখানি ?

৮. কোন বিধান সমূহের কায়া ও প্রাণ উভয়ই উদ্দেশ্য এবং কোনগুলোর শুধুমাত্র প্রাণই উদ্দেশ্য, কায়া উদ্দেশ্য নয় ?

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

১. মুসাল্লামু'স সুবূত, পৃষ্ঠা ৬ এবং শরহে তওদীহ।
২. খুসূসী কানূনে রুমা, ৫ পৃষ্ঠা।
৩. খুসূসী কানূনে রুমা, ২৫ পৃষ্ঠা।
৪. كل সমগ্র, كلى সামগ্রিক, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য , বহুবচনে كليات - جزء অংশ, جزئ আংশিক।
৫.১ আল মাওয়াফিকাত, ৩য় খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।
৫.২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ-২৬৬।
৬. আহকামুল কুরআন।
৭. ঐ ৩য় খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।
৮. তাফসীরে কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১, ২, ৩ পৃষ্ঠা।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. তাফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড এবং শায়খ জাদা আলী কৃত তাফসীর বায়দাবীর ফুটনোট, ২৫৭ পৃষ্ঠা।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. নূরুল আনওয়ার, ১৭১ পৃষ্ঠা।
১৩. তরজমানুল কুরআন, ২য় খণ্ড।
১৪. হুজ্জাতুল্লাহি'ল বালিগা, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭-৫২

মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

। পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

ভেজাল সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম

ফকীহদের ঐক্যমতে, ভেজাল হয় কথায়, কর্মে। তা মালের দোষ গোপন করা, ধোকা, প্রতারণা, লেনদেন, যে ক্ষেত্রেই হোক তা হারাম, উল্লেখিত হাদীসসমূহ তার প্রমাণ।

খাত্তাবী বলেন, হাদীসের ভাষ্যমতে ভেজালকারী ও প্রতারণাকারী সম্পূর্ণ ইসলাম বিচ্যুত হয় না। এর অর্থ সে রাসূলের আদর্শিক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কারণ ইসলামের আদর্শ হলো, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই; সুতরাং সে তার ভাইয়ের কাছে খাদ্যদ্রব্য, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা অন্য যে কোন মালের দোষ জানা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখে বিক্রি করতে পারে না। যদি সে পণ্যের কোন ক্রটি না বলে গোপন রাখে তা হলে সে ভেজাল করল এবং ধোকা দিল। তার এ কাজে আল্লাহ্ ও তার ফেরেশ্তাগণ তাকে অভিসম্পাত দিবেন।[৯৯] হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি কোন মুসলমান ভেজাল ও প্রতারণাকে হালাল মনে করে তা হলে সে কাফের হয়ে যাবে। তাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। ফকীগণ এ বিষয়ে একমত, বেচাকেনার ক্ষেত্রে ভেজাল না করে প্রকৃত মাল বিক্রি করা ওয়াজিব।

ইমাম গাযালী বলেন, লেনদেনের সময় চারটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

১. কোন দ্রব্যের এমন গুণ ও প্রশংসা করা যাবে না যা তার মধ্যে নেই।

২. দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কোন দোষ থাকলে তা গোপন করা যাবে না।

৩. মালের ওজন পরিমাণে কোন কম বেশী করা যাবে না।

৪. লেনদেনে মূল্য অস্পষ্ট রাখা যাবে না।[১০০]

যদি কেউ তা গোপন রাখে তাহলে সে ক্রয় বিক্রয়ে ভেজাল ও ধোকার আশ্রয় নিল। এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় হারাম। অধিকাংশ ফকীহ্গণ লেন-দেনে এ কাজকে ভেজাল ও প্রতারণা হিসাবে গণ্য করেন। ইবনে আবেদীন বলেন, ভেজাল করার অর্থ-সে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভোগ করল। আল্লাহ্ বললেন .... হে ঈমানদারগণ! তোমরা বাতিল উপায়ে পরস্পরের ধন সম্পদ ভক্ষণ করো না।[১০১]

লেখক ঃ প্রফেসর, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ভেজাল শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা শুধু খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ভেজাল করাকে ভেজাল মনে করে থাকি। হাদীসে এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভেজাল এক ধরনের প্রতারণা ও ধোকা। এ ধোকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ভেজাল করার মাধ্যমে ধোকা দেয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, ধোকা ও প্রতারণা করা হারাম এবং তার স্থান জাহান্নামে।১০২

যদি ভেজাল বা ধোকা হারাম না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ্ স. উহা নিষেধ করতেন না এবং কোন শর্ত আরোপ করতেন না।

অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক ধরণের ভেজাল পাওয়া যায়। ফকীহগণ তাদের যুগের ব্যবসা বাণিজ্যে ও পণ্য উৎপাদনে ভেজালের অনেক চিত্র তুলে ধরেছেন।

১.ধোকা ঃ বিক্রির সময় ক্রেতার সাথে দ্রব্যের মূল্য ও দোষ গোপণ রেখে মিথ্যা কথায় বিক্রি করা, অথবা বিক্রির পূর্বে উষ্ট্রী, বকরী বা গাভীর দুধ দোহন না করে জমিয়ে রাখা যাতে ক্রেতা মনে করে উষ্ট্রী অনেক দুধ দেয়। এ ভাবে ভেজাল করে ক্রেতাকে ধোকা দেয়া। এ ধরনের ভেজাল ও ধোকার লেনদেনের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, হাম্বলী ও আবু ইউসুফের মতে ক্রেতা ইচ্ছে করলে তা গ্রহণ করতে অথবা ফেরত দিতে পারে। ইমাম আবু হানিফার মতে দুধ কম পাওয়া গেলেও তা ফেরত দেয়া যাবে না।

২. মালের মূল্য কম বেশী করে ধোকা দেয়া, অর্থাৎ স্বাভাবিক বাজার মূল্য থেকে মালের মূল্য কম বা বেশী করে গ্রহণ করা, এটা এক ধরনের ভেজাল। তা হারাম।

৩. দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারায় ভেজাল ঃ আল্লাহ তাআলা ওজনে কম বেশী করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, পণ্যদ্রব্যের ওজন পূর্ণ করো, ওজনে কম দিও না। সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর। লোকদেরকে পরিমাণে কম বা নিকৃষ্ট কিংবা দোষযুক্ত দ্রব্য দিও না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়কারী হয়ে বিপর্যয় করে বেড়াইও না। ১০৪

এভাবে ওজনে ভেজাল ধোকা চুরি খেয়ানত করে অন্যায়ভাবে ভেজালকারীগণ মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে থাকে।

৪. অতিরিক্ত মুনাফা করে ভেজাল করা ঃ যেমন ক্রয় বিক্রির সময় মিথ্যা শপথ করা আমি একশত টাকায় মালটি ক্রয় করেছি, তুমি একশত দশ টাকা দাও। অথচ সে মালটি ৯০ টাকায়ও বিক্রি করে। এখানে ধোকা ও ভেজাল করে বেশী মুনাফা অর্জন করেছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এ ধরনের বিক্রির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দশ টাকা ক্রেতা চাইলে অবশ্যই তাকে ফেরত দিতে হবে।

৫. অনেক সময় নকল পণ্যের উপর আসল পণ্যের সীল মেরে দেয়া হয় কিন্তু যে পণ্য হস্তান্তর করে তা হয় ভেজাল ও নকল।

৬. কোন দ্রব্যের অধিক প্রশংসা অথবা বদনাম করা এক প্রকার ভেজাল ও ধোকা।

ব্যবসা বাণিজ্য ও খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধোকা, প্রতারণা এক ধরনের ভেজাল।

বিবাহের সময় যৌন কর্মে অক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্ব জেনেও কোন নারী পুরুষের বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এক ধরনের প্রতারণা ও ভেজাল।

রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, কোন ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত জমির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।[১০৫]

শাসকদের ধোকা ও প্রতারণা

রসূলুল্লাহ্ বলেন,

عن معقل ابن يسار رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما من عبد يشرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الاحرم الله عليه الجنة

মাকাল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে খেয়ানত করে এবং যে দিন মৃত্যু অবধারিত সে দিন মৃত্যু বরণ করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন।[১০৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয় সে যদি ভেজাল প্রতারণা করে মারা যায়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন।[১০৭]

তাদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে নসিহত করা, সঠিক পথে পরিচালিত করা কিন্তু তারা এ দায়িত্ব পালন না করে বড় ধরনের খেয়ানত করেছে। রাষ্ট্রের সকল কিছু প্রশাসনিক ব্যক্তিদের নিকট আমানত। ইসলাম এই আমানত তার যোগ্য প্রাপকের নিকট পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পন কর।[১০৮]

রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল নিয়ামতের দিন তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১০৯]

ইমাম নব্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ধোকা প্রতারণাকে কবিরাহ্ গুনাহ্ মনে করতেন।

পরামর্শের ক্ষেত্রে ভেজাল

কাউকে পরামর্শ দিলে সঠিক পরামর্শ দিবে, যদি সঠিক পরামর্শ দেয়া না হয় তাহলে পরামর্শের ব্যাপারে তা ভেজাল পরামর্শ হিসাবে গণ্য হবে, এবং সঠিক পরামর্শ গোপন করার কারণে খেয়ানতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে সঠিক পরামর্শ দেয় না সে খেয়ানতকারী হিসেবে গণ্য হবে।[১১০]

তেমনিভাবে যদি কেউ কোন নারীকে বিবাহ্ করতে তোমার পরামর্শ চায় আর তুমি তার দোষ জান এবং চুপ থাক তাহলে তুমি আমানতের খেয়ানত করলে, কারণ পরামর্শদাতা আমানতদার। সুতরাং তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে তুমি তা প্রকাশ করে দিবে। অন্যদিকে কোন নারীর দোষ ও গুণ বেশী বা কম বলাও এক প্রকার প্রতারণা ও খেয়ানত।

তথ্য ও প্রচার মাধ্যমে ভেজাল ও প্রতারণা

অশ্লীল, উলংগ ছবি, অশ্লিল ওডিও ভিডিও প্রচার এবং আমদানী করে যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট করা, প্রচার মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা, প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল রেখে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে সমাজে ফাসাদ-হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন না করে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করে মানুষকে উত্তেজিত করা, সমাজকে অন্যায় অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়া এক ধরনের প্রতারণা ধোকা ও ভেজাল কর্ম। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[১১১]

অপরাধীকে তার অপরাধে সাহায্য করা ভেজাল

তোমার একজন মুসলমান ভাই অপরাধ করছে, তুমি তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। অথচ তুমি তাকে বাধা দিচ্ছ না। তাহলে তুমি তাকে অন্যায় কাজে সাহায্য করলে। এটা এক প্রকার ধোকা ও ভেজাল কাজ। তেমনি অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা বাণিজ্যে আমদানী রপ্তানীতে ভেজাল করে অধিক অর্থ উপার্জন করছে, অনেকে নেশা জাতীয় পণ্য আমদানী করছে। তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব। আবার কেউ কেউ অশ্লীল ছবির ব্যবসা করছে। এ সব প্রতারণা ও ভেজাল কাজ ।

অনেক ব্যাংক আমদানীকারককে বলছে, তুমি পণ্য আমদানী কর আমরা তোমাকে ঋণ দেব। তুমি তা পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু আমদানীর সময় বেড়ে গেলে ঋণের বোঝাও বেড়ে যায়, পরিণামে তার সমস্ত ব্যবসা সুদের কারবারে পরিণত হয় এটিও এক ধরনের প্রতারণা ও ভেজাল।

ভেজাল প্রতিরোধে দুটি করণীয়

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে এর প্রতিকার করা ও ২. নৈতিকভাবে এর প্রতিকার করা।

এক. রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিকার ঃ এক্ষেত্রে আমরা রসূলুল্লাহ স. সাহাবা ও পরবর্তী যুগের ব্যবস্থা আলোচনা করব।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য ও বাজার দেখাশুনার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করা। সাহাবাদের যুগে শাসকগণ নিজেরাই এ কাজ করতেন। রসূলুল্লাহ স. নিজেও এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাসূলের যুগে ভেজাল প্রতিরোধ

রসূলুল্লাহ স. যখন দেখলেন মানুষ মূর্তি ও পাথর পূজা করছে, আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করছে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, তোমাদের এ সব মূর্তি ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। তিনি তাদেরকে সুদ খেতে দেখে সুদ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং তা হারাম ঘোষণা করলেন। তিনি তাদেরকে যে জিনিস আয়ত্তে নেই, তা বিক্রি করতে, গর্ভস্থিত পশুর বাচ্চা বিক্রি করতে, বকরী দোহন না করে দুধ জমা করে, গ্রামের লোকদের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রি করতে, কাফেলার সাথে অগ্রবর্তী হয়ে মিলিত হতে, অপরিপক্ক ফল

বিক্রি করতে, এবং খাদ্য শস্য ও ফল অগ্রিম ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। খাদ্যদ্রব্যে কেউ ভেজাল মিশ্রিত করে কিনা তা দেখার জন্য তিনি নিজেই কোন এক খাদ্য বিক্রেতার স্তূপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বললেন, যে আমাদের সাথে ধোকাবাজি করবে, মালে ভেজাল দিবে সে আমার দলভুক্ত নয়।[১১২]

রসূলুল্লাহ স. আলী রা. কে যখন ইয়ামেনে পাঠান তখন তাকে অসিয়ত করেছিলেন, কোন মূর্তি দেখলে তা ভেংগে দিবে। আর কোন উঁচু কবর দেখলে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। [১১৩]

নাফে ইবনে ওমর রা. বলেন, আমরা রাসূলের স. যুগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতাম, তিনি আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন বিক্রিত দ্রব্য হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ না করি।[১১৪]

ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ স. এর সময়ে লোকেরা অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করত এ জন্য তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হত। কেননা তারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তাদের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দিত। [১১৫]

রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের পরে সাঈদ ইবনুল আস এবং ওমর রা. কে যথাক্রমে মক্কা ও মদীনার বাজার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন।[১১৬]

উমর রা. খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর নিজেই বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মুসাইব ইবনে দারেম বলেন, আমি উমর রা. কে দেখেছি, তিনি বোঝা বহনকারীকে বেত্রাঘাত করতে করতে বললেন, তোমার উটের উপর এত বেশী বোঝা নিয়েছ যা সে বহন করতে অক্ষম।[১১৭]

* একবার উমর রা. দেখলেন, এক ব্যবসায়ী খুব সস্তাদামে মাল বিক্রি করছে আর খরিদ্দারগণ সেখানে ভিড় করছে। তিনি সে ব্যবসায়ীকে বেত্রাঘাত করে বললেন, তুমি আমাদের বাজার থেকে চলে যাও। একচেটিয়া ব্যবসা এখানে নয়। [১১৮]

উমর রা. বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পরিদর্শন করতেন। একবার তিনি হাতেব ইবনে আবি বুলতার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার সামনে কিসমিসের দুটি বেগ ছিল। তিনি তাকে এর মূল্য জিজ্ঞেস করলে সে বললো, প্রত্যেক বেগের মূল্য দু'দিরহাম। উমর রা. তাকে বললেন, একটু পরে তায়েফ থেকে উটে করে কিসমিস আসবে তারা আসলে তোমার কিসমিসের মূল্য নির্ধারন করা হবে, তুমি বর্তমান দামে বিক্রি বন্ধ কর। অথবা তুমি এ গুলো ঘরে নিয়ে যেভাবে চাও বিক্রি কর। ওমর রা. ফিরে এসে চিন্তা করলেন তারপর হাতেবের কাছে এসে বললেন, আমি তোমাকে যে কথা বলেছিলাম এটা আমার পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা নয়। বরং শহরের অধিবাসীদের কল্যাণে আমি কথাটি বলেছিলাম। এখন তুমি যে বাজারে চাও তোমার কিসমিস বিক্রি করতে পার।[১১৯]

হযরত উমর রা. একবার বাজারে এক যুবককে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে বিক্রি করতে দেখলেন, তিনি সে দুধ তার মাথায় ঢেলে দিলেন। [১২০]

তিনি তার খেলাফতকালে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেই এ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে হাসালী ও সায়েব ইবনে হাযালীকে হযরত উমর রা. বাজার পরিদর্শনের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। [১২১]

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা. নিজেই বাজার পরিদর্শন করতেন।

একবার তিনি বাজারে গোশ্‌ত বিক্রেতাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে কসাইরা! তোমরা গোশ্‌তের মধ্যে ফুঁ দিবে না। যে গোশতে ফুঁ দিবে সে আমার দলভুক্ত নয়।[১২২]

* একবার ব্যবসায়ীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা ক্রয় বিক্রয়ে শপথ করা থেকে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ মিথ্যা শপথে দ্রব্যের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।[১২৩]

আব্বাসীদের যুগে ভেজালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তাবারী বলেন, আবু জাফর মনসুর বাগদাদের বাজারে আবু যাকারিয়া নামে এক ব্যক্তিকে পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সে সাধারণ ও গরীব মানুষের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ণ করার কারণে মনসুর তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন এবং হাদী নাফে ইবনে আবদুর রহমানকে বাজার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন।

*খলিফা মুসতারশেদ (৫১৩-৫২৯ হিঃ) কাযী আবুল কাশেম যায়নীকে বাজার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তিনি বাজারের ব্যবসায়ীদের সৎভাবে ব্যবসা করতে বলেন। বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য সঠিক কিনা তা দেখাশুনা করতেন। বাজারে ওজনে কমবেশী এবং বাটখারা ঠিক আছে কিনা এগুলোও দেখতেন।

* খলিফা নাসের উদ্দিন (৫৭৫-৬২২ হিঃ) কাযী মহিউদ্দিনকে বাজার পরিদর্শক নিয়োগ করেন। তিনি বাজারে গিয়ে ঘোষণা দিলেন, কেউ যদি বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে, মিথ্যা কসম করে ক্রয় বিক্রয় করে, ভেজাল দেয়, দালালী করে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।[১২৫]

ফাতেমীদের যুগে বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

ফাতেমী যুগে হাকিম আমরিল্লাহ ফাতেমী মিসরের কাযীর নিটক লিখে পাঠালেন, তিনি যেন বাজার পরিদর্শন করেন। চিঠিতে তিনি কাযীকে লিখলেন, মসজিদের ইমাম ও মুয়াযযীনগণ যেন নিজ ইচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করেন। মানুষ যেন নামাজের সময় গল্প গোজব না করে, স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয় বিক্রয়ে যেন কেউ ভেজাল না দেয়। গমের আটার সাথে চাউলের আটা মিশ্রিত না করে। এতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১২৬]

ফাতেমী খলিফা আকিদ ফাতেমীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, কোন নারী যেন মাহরাম ছাড়া একাকী সফর না করে, কেউ যেন ওজনে কম বেশী না করে, গুদামজাত করে যেন বাজারে খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট না করে। লেনদেনে হালাল হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখে। ব্যবসা বাণিজ্যে কেউ যেন ধোকা প্রতারণা ও ভেজাল না করে। বাজারের লোকেরা যেন জামাতে নামায আদায় করে। সকল কাজের আগে আল্লাহর ভয় ও তার সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। ফাতেমীদের যুগে বাজার পরিদর্শকের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তিনি সেখানে নিয়মিত বসতেন এবং বাজারের দেখাশুনা করতেন। যাতে ব্যবসায়ীগণ কোন প্রকার ভেজাল দিতে না পারে। বিশেষ করে ওজন ও বাটখারা ঠিক আছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য দারুল আইয়ান নামে একটি স্থান নির্ধারিত ছিল। যখন পরিদর্শক কোন ব্যবসায়ীকে তার মাপার যন্ত্র ঠিক আছে কিনা ডাকতেন সে হাজির হতে বাধ্য হত। তেমনি সমস্ত প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রি

করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কেউ অপরাধী হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হতো, অথবা জেলে দেয়া হতো।[১২৭]
উসমানী খেলাফতের যুগেও বাজার পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে তারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ভাল মাল দেখিয়ে খারাপ মাল দিলে পরিদর্শক সেখানে হস্তক্ষেপ করতেন।

বিভিন্ন দ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধের ব্যবস্থা

পূর্ব যুগে বাজার পরিদর্শনের জন্য লোক নিয়োগ করা হত। তারা বাজারে নিষিদ্ধ মাল বিক্রি ও সকল প্রকার ভেজাল, ধোকা, প্রতারণা ও মিথ্যা থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার ব্যবস্থা করতেন।

১. পরিদর্শক বাজারে রুটি প্রস্তুতকারী সকল দোকানের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখতেন। সব সময়ের জন্য তাদের দোকান খুলে রাখতে আদেশ দেন। তাদেরকে আটার সাথে চাউলের আটা মিশিয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেন।[১২৮]

২. বাবুর্চীদেরকে রান্না করা জিনিস ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিতেন, যাতে তার উপর মাছি না বসে। তেমনি বকরীর গোশ্‌তের সাথে ভেড়ার ও গরুর সাথে উঠের গোশত মিলিয়ে রান্না করতে নিষেধ করতেন।

৩. জবাই পরিদর্শন ঃ পরিদর্শক সকল কসাইকে নির্দেশ দেন সবাই যেন ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে, যাতে পশু কষ্ট না পায় এবং জবাইকৃত পশু ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া না কাটা এবং চামড়া ছড়ানোর সময় ফুঁ দিতে নিষেধ করতেন।[১২৯]

৪. মিষ্টান্ন বিক্রেতা ঃ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হত তারা যেন খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখে যাতে মাছি না বসতে পারে এবং মধুর সাথে আঙ্গুরের রস মিশিয়ে কোন কিছু তৈরী না করে, এদের কেউ ভেজাল করলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো।[১৩০]

৫. মুদি মাল বিক্রেতাদেরকে পণ্য দ্রব্যে পানি দিয়ে ওজনে ভারী করে বিক্রি করতে নিষেধ করা হতো এবং দোকানে তরি তরকারীর কিছু অবিক্রিত থেকে গেলে তা অন্য মালের সাথে না মিশিয়ে ভিন্নভাবে বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হত।

পরিদর্শক কাপড়ে বা সূতাতে রং কারকদের সতর্ক করে দিতেন, তারা যেন রংয়ের সাথে মেহেদী মিশ্রিত না করে। কারণ রংয়ের সাথে মেহেদী মিশালে সূর্যের তাপে সে কাপড়ের রং নষ্ট হয়ে যায়। তেমনিভাবে ওষুধে যেন কোন ভেজাল মিশানো না হয় এবং দালাল দিয়ে মাল ক্রয়, অভিভাবক ছাড়া এতিম ও ছোটবালকদের নিকট মাল বিক্রয়, আতরের সাথে অন্য কিছু মিশানোর ক্ষেত্রে পরিদর্শক দেখাশুনা করতেন।

ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভের ক্ষেত্রেও খোঁজ খবর নেয়া হতো। বেশী লাভ করলে বিক্রেতার নিকট থেকে তা ফেরত নেয়া হতো এবং তাকে শাস্তি দেয়া হত। যদি কেউ উচ্চমূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করত তাকে বাজার থেকে বের করে দেয়া হত। কেউ ভেজাল মাল বিক্রি করলে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হত।[১৩১]

গুদামজাত ধোকা প্রতারণা ও ভেজাল বিক্রির শাস্তি

এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য ঃ

১. বেত্রাঘাত

বাজারে কোন ব্যবসায়ী অল্পদামে একচেটিয়া ব্যবসা করার কারণে এবং অতিরিক্ত বোঝা উটের পিঠে দেয়ার অপরাধে হযরত উমর রা. বেত্রাঘাত করেছেন।[১৩২]

হযরত আলী রা. চুরি ধারালো না করে একটি বকরী জবেহ করলে এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করে বললেন, তুমি কেন প্রথমে চুরিটি ধার দিয়ে নিলে না।[১৩৩]

এসব অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

আল্লাহর হদ্দ ব্যতিত দশ বেত্রাঘাতের বেশী দিবেনা। উক্ত দলিল দ্বারা বুঝা যায় পরিদর্শক সর্বোচ্চ দশ বেত্রাঘাত দিতে পারবে।[১৩৪]

২. আর্থিক জরিমানা

মদ বিক্রি করার কারণে রসূলুল্লাহ সা. মদীনাতে এক ব্যবসায়ীর পাত্র ভেঙ্গে দিলেন এবং তার টাকা একটি সময় পর্যন্ত আটক করে রাখলেন। একজন পুরুষ স্বর্ণের আংটি পরিধান করার কারণে তার কাছ থেকে তা খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন।[১৩৬]

তাঁকে অনুসরণ করে সাহাবাগণও এ কাজ করেছেন। হযরত উমর রা. এক ব্যক্তি মদ বিক্রি করার কারণে তার দোকান পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত উমর রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে দুধের সাথে পানি মিশ্রিত করছে, উমর রা. সে দুধ তার মাথায় ঢেলে দিলেন। হযরত আলী রা. কোন এক বাড়ীতে মদ বিক্রি হচ্ছে শুনে সে বাড়ীটি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

তেমনি বাজার পরিদর্শক কোন ব্যক্তিকে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল করতে দেখলে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে তার সমস্ত মাল সম্পদ আটক করে রাখতেন।

৩. সামাজিক ভাবে অপরাধীকে বয়কট করা

প্রশাসনের পক্ষ থেকে অপরাধীকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বয়কট করার নির্দেশ দেবে এবং জনসাধারণকে এ খবর জানিয়ে দেবে তারা যেন তাকে বয়কট করে। এর কারণ যাতে ব্যবসায়ী মহল অবহিত হয় যে, সে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, ধোকা, প্রতারণা, করার ও ওজনে কম দেয়ার দরুন তার এ শাস্তি। এর পর তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং দেশে বিদেশে তার সকল ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে। যেভাবে রসূলুল্লাহ স. তিনজন সাহাবীকে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে বয়কট করেছিলেন।[১৩৭]

৪. অপরাধীকে জনসাধারনের সামনে প্রকাশ করা

অপরাধীকে জনসম্মুখে প্রকাশ করতেন। তবে প্রকাশ করার ধরন ছিল তাকে এক ধরনের নিকৃষ্ট পোষাক পরিধান করিয়ে উট অথবা গাধার পিঠে বসানো হতো। এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে বাজারে চক্কর দিত এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে ঘোষণা দিত, অমুখ ব্যক্তি বাণিজ্যে ভেজাল ও ধোকা দিয়েছে, তোমরা তার ব্যাপারে সাবধান থাক। হযরত উমর রা. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কারণে অপরাধীকে একটি উটে উল্টো করে চড়িয়ে তার মুখ মন্ডলে কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়েছেন। যাতে করে মানুষের নিকট সে ভেজালকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।[১৩৮]

তখনকার যুগে উন্নত প্রচার মাধ্যম ছিল না, যে কারণে শাসকগণ এ ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমান যুগে মিডিয়ার যুগ। সুতরাং মিডিয়ার মাধ্যমে এসব অপরাধীকে সহজে প্রকাশ করা যায়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সংবাদ মাধ্যম ও টেলিভিশনে তাদের ভেজাল ও ধোকাপূর্ণ বিক্রির চিত্র তুলে ধরা যায়। এবং যে ভাবে সে ভেজাল করেছে স্থান কাল ও ছবিসহ তা প্রকাশ করা যায়।

৫. দেশ থেকে বহিষ্কার

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, ধোকা, প্রতারণা ও গুদামজাত করার কারণে সরকার ইচ্ছে করলে তাকে অন্যদেশে সাময়িক ও চিরস্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করতে পারে। যাতে সমাজে কেউ ভেজাল প্রতারণা, চুরি করার সাহস না পায়।[১৩৯]

শাস্তির ব্যাপারে ফকীহদের মতামত

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, ভেজাল প্রতারণার শাস্তি ৩৯টি বেত্রাঘাত।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, ৭৯টি বেত্রাঘাত।

কোন কোন ফকীহ বলেছেন, ৭৫টি বেত্রাঘাত।

কেউ বলেছেন, কম পক্ষে ৩টি বেত্রাঘাত।

কোন ফকীহ বলেছেন শাস্তির বিষয়টি কাযীর ইখতিয়ারাধীন

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ২০টির অধিক নয়।

আহম্মদ ইবনে হাম্বল বলেছেন দশটির বেশী নয়।

তারা রসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। রাসূল স. বলেছেন, হদ্দ ব্যতীত ১০টির বেশী বেত্রাঘাত হবে না।

ইমাম মালেকের মতে এটি কাযীর ইচ্ছাধীন, কাযী তার অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করবেন।[১৪০]

ইমাম মালেকের মতে ভেজাল প্রতারণাপূর্বক অর্জিত মাল গরীব অনাথ ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হবে। সংশোধন ও তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ব্যবসা থেকে দূরে রাখতে হবে।

নৈতিক প্রতিকার

কেবল পেটের দাবী পূরণ করা, নিছক জঠর জ্বালা নিবৃত করা কিংবা প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদ উপার্জন করাই মানুষের লক্ষ্য নয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। এ পৃথিবীতে সত্যের ন্যায়ের ও পূণ্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আর অন্যায় ও জুলুমের বিলোপ সাধন করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য।

ইসলাম ন্যায়- নিষ্ঠা ও ইনসাফ, সততা, আমানতদারী, পারস্পরিক সহযোগিতা, উপদেশ, ক্ষমা ও ভালবাসার দীন। এগুলো নির্ভর করে মানুষের আচার আচরণের উপর। মানুষের আচরণ অন্যায় অত্যাচার নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, মিথ্যা, খেয়ানত, ধোকাবাজী, ভেজাল, হিংসা বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক ইসলাম কখনও তা পছন্দ করে না। অন্যায়ভাবে কেউ মানুষের মাল ভক্ষণ করবে, হারাম ও অবৈধ ব্যবসা করবে, আল্লাহর নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হবে তা ইসলামে চিন্তা করা যায় না।

মানুষ যদি অর্থনৈতিক লেনদেনে ইসলাম ও বিশ্বাসকে লালন করে তাহলে তার মধ্যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার গুণ সৃষ্টি হবে। সেখানে আল্লাহ বরকত দিবেন এবং তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে। আর যদি সে অধিক লোভ লালসা করে শুধু অর্থকেই জীবন মনে করে তাহলে মুসলমানদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। সে বিবাদ তাদের হাট, বাজার, ব্যবসা বাণিজ্যে ছড়িয়ে পড়বে, যেভাবে উসমানী খেলাফতের শেষ দিকে মুসলিম শাসকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল, যে কারণে তারা হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে তাদের ঐক্য বিনিষ্ট করেছিল। এ সুযোগে ইসলামের শত্রুরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে। এ পর্যায়ে লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব ঃ

১. হারাম মাল উপার্জন থেকে বিরত থাকা

সুদ, ভেজাল, গুদামজাত, ধোকা, প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদের লালসা করা হারাম। ইসলাম হালাল পন্থায় অর্থ উপাজর্নের নির্দেশ দিয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে- হে মানব মন্ডলী, তোমরা জমিনে হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্যে হতে ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।[১৪১] রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান সদকা করে, তা কবুল হবে না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকত হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায় তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র।[১৪২]

তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো খুস্কো, পদযুগল, ধূলো-মলিন। সে তার দুটি হাত উপরের দিকে তুলে বারবার দুআ করে, আল্লাহ! আল্লাহ! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম, হারাম খাদ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে। এ ব্যক্তির দু'আ আল্লাহর কাছে কি করে কবুল হতে পারে?[১৪৩]

২. সুদের ব্যবসা

মজুদদারীর সব চাইতে অভিশপ্ত ধরন হল সুদের লেনদেন। সুদ ব্যবস্থায় কোটি কোটি মানুষকে অভাবী ও গরীব বানিয়ে ধন সম্পদ মহাজনদের হাতে কুক্ষিগত হয়। আল্লাহ তাআলা বাণিজ্যিক বেচাকেনা জায়েয করেছেন এবং সকল প্রকার সুদের ব্যবসা হারাম করেছেন।[১৪৪]

রসূল স. সুদ ব্যবসায়ী ও সুদ ব্যবসা সম্পর্কিত হিসাবপত্র ও লিপিবদ্ধকারীকে অপরাধী বলে ঘোষণা করেছেন।

সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদী ব্যবসার লেখক ও সাক্ষীদাতাদের উপর রসূলুল্লাহ স. অভিশাপ করেছেন।[১৪৫]

অন্যত্র রাসূল বলেন-জেনে শুনে একটি দিরহাম সুদ খাওয়া ত্রিশটি জ্বিনার চেয়ে গুরুতর অপরাধ।[১৪৬]

৩.সরকারের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা

সরকারের নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে ইনসাফ ও যুক্তিসংগত লভ্যাংশ রয়েছে। যদিও লাভের ব্যাপারে ইসলাম কোন সীমা নির্ধারন করেনি। কিন্তু তিনভাগের এক ১/৩ এর বেশী লাভ করা বৈধ নয়। রাসূল স. বলেছেন, তিনভাগের এক ভাগ এর চেয়ে অধিক নয়।[১৪৭]

৪. লেনদেনে সত্য কথা বলা

লেনদেনে সত্য কথা বলা উত্তম বৈশিষ্ট্য। রাসূল স. বলেন, সত্যবাদী ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।[১৪৮]

৫. কিরা-কসম করে মাল বিক্রি করা

ধোকাবাজির সাথে মিথ্যা কিরা কসম করে মাল বিক্রি করা হারাম। নবী করিম স. ব্যবসায়ীদের মিথ্যা কসম করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিরা কসম দ্বারা পণ্য বিক্রি করা যায় কিন্তু বরকত পাওয়া যায় না।[১৪৯]

৬. আমানতদার হওয়া ভেজাল পরিত্যাগ করা

মালের সঠিক প্রশংসা করা, কোন দোষ থাকলে বলে বিক্রি করা। ধোকা না দেয়া, অতিরিক্ত মূল্য দাবী না করা। অন্যথায় ব্যবসায়ীর সুনাম ও সুখ্যাতি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন তার এসব খারাপ চরিত্র জানতে পারে, তখন তার কাছ থেকে মাল ক্রয় করে না। রাসূল স. বলেন, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, দোষযুক্ত কোন মাল তার কাছে বিক্রি হালাল নয় যতক্ষণ সে দোষ বলে না দেয়।[১৫০]

সুতরাং লেনদেনে সে আমানতদার হবে, হালাল পন্থায় ব্যবসা করবে, চোরাপথে, বল প্রয়োগ করে বিক্রি করবে না। ভাল জিনিস দিবে, খারাপ জিনিস দিবে না প্রতারণা ও ধোকা দিবে না।

৭. বেশী বেশী সাদকা করা

সম্পদের মোহ থেকে অন্তরকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। ব্যবসায়ীদেরকে তাদের মাল পবিত্র রাখার জন্য রসূলুল্লাহ স. তাদের উদ্দেশ্য বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় শয়তান ও গুনাহ এসে উপস্থিত হয়। অতএব তোমরা ব্যবসায়ের সাথে দান-খয়রাতও যুক্ত কর।[১৫১]

অন্যত্র রাসূল স. বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ক্রয় বিক্রয়কালে শপথ ও বেহুদা কথাবার্তা হয়ে যায়, তাই কিছু দান খয়রাত করে তা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে নাও।[১৫২]

৮. ক্রয় বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন

ক্রয় বিক্রয়ে মাফে ওজনে ও লেনদেনে উদারতা প্রদর্শনে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। রাসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি বিক্রয়কালে উদারচিত্ত ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত আল্লাহ্ সেই বান্দার প্রতি দয়া করেন।[১৫৩]

৯. জীবিকা অর্জনে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা

রাসূলুল্লাহ স. বলেন, হে লোক সকল তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোন ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষন কর; যা হালাল তাই গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা বর্জন কর।[১৫৪]

৯. ধন লিপ্সা থেকে দূরে থাকা

দুনিয়ার লোভ, ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহই মানুষকে অন্যায় পথে সম্পদ উপার্জন করতে বাধ্য করে। মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়াকে ভোগ বিলাসের একমাত্র স্থান মনে করে, অথচ ইসলাম ভোগ ও ধনলিপ্সাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন,..... নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদী তোমাদের জন্য ফেতনা, আল্লার নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।[১৫৫] রসূলুল্লাহ স. বলেন, পার্থিক ভোগ বিলাস পরিত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর তাহলে লোক তোমাকে ভালবাসবে।[১৫৬]

অন্যত্র রসূলুল্লাহ স. বলেন, আদম সন্তান আমার সম্পদ আমার সম্পদ ইত্যাদি বলতে থাকবে অথচ হে বনী আদম! ততটুকু তোমার সম্পদ। যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করেছ, পরিধান করে পুরনো করেছ, এবং দান খয়রাত করে পরকালের জন্য জমা রেখেছ।[১৫৭]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, দরিদ্ররা ধনীদের চেয়ে পাঁচশো বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৫৮]

তিনি আরো বলেন, সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার ধর্মের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে, বকরীর পাল ধ্বংস করার জন্য ছেড়ে দেয়া দুটো ক্ষুধার্থ নেকড়েও বকরীর পালের ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে না।[১৫৯]

ধন সম্পদের লালসা মানুষের এতো বেশী থাকে যে বৃদ্ধ অবস্থায়ও সে এর লোভ সংবরণ করতে পারে না। রাসূল স. বলেন, দুটি বস্তুর কামনা বৃদ্ধের অন্তরেও যুবক থাকে। দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্য্য।[১৬০]

১০. অর্থ নয় তাকওয়াই সম্মানের মানদণ্ড

সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি এত নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছে যে, তারা নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ-আদালত সবকিছুকে ফেলে রেখে অর্থকেই সব সময় বড় মনে কর। সমাজে যার যত বেশী সম্পদ সেই বেশী সম্মানিত; চাই সে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করুক। মানুষের মাঝে এ ধরনের চিন্তা চেতনা ছড়িয়ে পড়ায় আজ সমাজে চুরি, ডাকাতি গুদামজাত, ভেজাল, ধোকা, প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনের প্রতিযোগিতা চলছে।

ইসলাম অর্থ নয় বরং তাকওয়াকে সম্মানের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু। রাসূল স. অর্থ নয় বরং তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে সম্মানের চোখে দেখতেন। এ তাকওয়া অবলম্বন করে ওসমান রা. ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মত ধনবান সাহাবীগণ তাদের ব্যবসায়ী সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। তাঁরা ধন সম্পদ পুঁজি করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হননি। ওসমান রা. তার ব্যবসায়ী মাল জীবনভর আল্লাহর পথে দান করেছেন, মৃত্যুকালে কোন সম্পদ রেখে যাননি। আব্দুর রহমান মৃত্যুর সময় ৪০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা, ৪০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা, বদর সাহাবীদের ১০০ শ জনের খাদ্যের ব্যবস্থা এবং রাসূলের স্ত্রীদের বরণ পোষণের জন্য অসিয়ত করে গেছেন।[১৬১]

১১. বাজারে সব সময় আল্লাহর যিকির করা

রাসূল স. বলেন, বাজারে সব সময় আল্লাহর যিকির করবে। যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই। সমস্ত প্রশংসা তার জন্য "জীবন ও মৃত্যু তার হাতে" তিনি চিরঞ্জীব তার মৃত্যু নেই। তিনিই সমস্ত কল্যাণের মালিক। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। সেজন্য আল্লাহ ..... হাজার হাজার নেক তার আমল নামায় লিখে দিবেন। এবং তার আমলনামা থেকে হাজার হাজার গুনাহ দূর করে দিবেন। এবং তার জান্নাতে একখানা ঘর তৈরী করে দিবেন।[১৬২]

১২. মালের যাকাত প্রদান ঃ কোন ব্যবসায়ী তার পণ্যদ্রব্য এক বছর আটকে রাখলে বা কোন ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য এক বছর পর্যন্ত অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকলে সেগুলোর উপর যাকাত আদায় করা হয়। যদি পণ্যদ্রব্যেগুলো আরো এক বছর অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে তা হলে সেগুলো থেকে পুনরায় যাকাত আদায় করা হবে।

ইমাম মালেক বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সোনা রোপার পরিবর্তে গম, চাল, খরিদ করে রাখে এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিবাহিত হয় এবং সেগুলো বিক্রি করার পর দেখা যায় তার মূল্যমান নেসাব পরিমাণ হয়েছে, তাহলে যাকাত ওয়াজেব হবে।[১৬৩]

পণ্যদ্রব্যের উপর যাকাত ধার্য্য করার উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়ীরা যেন পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য তা গুদামজাত করে রাখার সুযোগ না পায়। [১৬৪]

১৩. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভাল ধারণা পোষণ করা

মানুষের রোজী রোজগারের সবকিছু নির্ভর করে আল্লাহর উপর খাঁটি তাওয়াক্কুল ও ভাল ধারণার উপর। আল্লাহ বলেন. ....

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করে দিবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।[১৬৫]

রাসূল স. বলেন, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ভরসা করতে তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা উদরপূর্তি করে বাসায় ফিরে আসে।[১৬৬]

সুপারিশমালা

১। সরকারীভাবে গুদামজাত, মোনাফাখোরী, ভেজাল, নিষিদ্ধ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে জুমআ'র খুতবায় অবৈধ ও সুদ ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।

৩। স্থানীয় সৎলোকদের নিয়ে বাজার কমিটি করা এবং তাদেরকে এ ক্ষমতা দেয়া তারা যেন অবৈধ ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করতে পারে।

৪। ব্যবসায়ীগণ যাকাত দেয় কি না তদারকীর ব্যবস্থা করা।

৫। অসৎ ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে প্রচার মাধ্যমে তাদের ছবি প্রকাশ করা। প্রয়োজনে তার মাল একটি সময় পর্যন্ত আটক রাখা এবং অবৈধ উপার্জিত অর্থ হিসাব করে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করা।

৬। সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে কল্যাণকর এসব বিষয়ে ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করণে আলোচনা সভা, সেমিনার ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

৭। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাজারে যুক্তিসংগত মূল্য তালিকা প্রকাশ করা এবং সরকারীভাবে তদারকীর ব্যবস্থা করা।

আমরা বিশ্বাস করি এসব প্রস্তাব বিবেচনা করলে মুনাফাখোর, মজুদদার, ভেজাল, ধোকা, প্রতারণামূলক ব্যবসা বাণিজ্য থেকে দেশ ও জনগণকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

৯৯. আদদায়া আশ শরীফা, মাজাল্লা, জামেয়া ইমাম মুহাম্মদ সউদ আল ইসলামিয়া সউদী আরব, সংখ্যা ১৩, প্রবন্ধকার শেখ সালেহ আবদুর রহমান ১৪০২ হি: পৃষ্ঠা ১০০। আল মুয়ামালাত আল-মালিয়া আল মুয়াস্‌সারা, ড. ওহাবা জুহাইলী, দারুল ফিকর, লেবানন, ২০০২, পৃষ্ঠা ১১৬

১০১. সূরা নেসা : ২৯

১০২. বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, পৃষ্ঠা: ৩১২

১০৩. উসতাদ মুসতফা যারকাজী আকদুত্‌তামীন, জামেয়া, দামেস্ক, ১৯৬২ পৃষ্ঠা ১১৬

১০৪. সূরা শুয়ারা : ১৮১-১৮৩

১০৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, ওয়াল গসব, হাদীস নং ২২৭৪

১০৬. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-২০৩

১০৭. পূর্বোক্ত

১০৮. সূরা আল হুজরাত : ১১

১০৯. সহীহ বুখারী, ফিতাবুন নিকাহ

১১০. মুসনাদ আহমদ, খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা : ২৭২

১১১. সূরা নিসা : ১৯

১১২. বুখারী, মুসলিম শরহে নববী, খন্ড, ২, পৃষ্ঠা ১০৯

১১৩. পূর্বোক্ত, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৬

১১৪. যাদুল মাআদ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫

১১৫. বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৩৬ হা নং ১৯৮৯, ইঃ ফা. ঢাকা

১১৬. আবদুল হাই ইবনে আবদুল কবির কাত্তানী, তারাতীবুল এদারীয়া, দারু কুতুবুল আরাবী, বৈরূত, খন্ড ১ পৃষ্ঠা ১৮০।
১১৭. কানযুল উম্মাল, খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা: ১৭৬
১১৮. পূর্বোক্ত, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৬
১১৯. আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী ইবনে হিসাম হিন্দি, কানযুল উম্মাল, প্রকাশ জামিয়া দায়েরাতুল মাআরিফ উসমানিয়া, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ১০৪
১২০. ইবনে তাইমিয়া, আল-হিসবা ফিল ইসলাম, দারুল বায়ান, দামেস্ক ১৩৮৭ হিঃ পৃষ্ঠা ৬১।
১২১. ইবনে আবদুল বার আল-এসতিয়াব, মাকতাবা নাহদা, মিসর, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৭৬
১২২. কানযুল উম্মাল, পূর্বোক্ত, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৯।
১২৩. পূর্বোক্ত খন্ড, ৪, পৃষ্ঠা ৯৯
১২৪. তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৪৬।
১২৫. আবু আব্বাস মাহমুদ ইবনে আলী কালকাসান্দি, সবুহে আসা ফি সানায়াতুল ইনসা, খন্ড ১০, পৃষ্ঠা : ৩৮৪
১২৬. মাকবেরী, খুতাত আল-আসার হালবী, মিসর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৩
১২৭. পূর্বোক্ত।
১২৮. নেয়াতুর বতরা পুরোক্ত, প: ৩৪
১২৯. মুহাম্মদ আহমদ কারসী, মুয়ালেমূল কুবরা ফি আকায়ুল হিসবা, দারুল ফনুন, (কেরারিজ পৃ: ৯৯)
১৩০. নেহায়াতুর রাতবা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৪০
১৩১. পূর্বোক্ত
১৩২. কানযুল উম্মাল, খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ১১২
১৩৩. আবদুল কাদের আওদা, তাশরীঈল যানাই আল ইসলামী, ১৩৮৩ হি: পৃষ্ঠা ৫০৭
১৩৪. নাইলুল আওতার, খন্ড ৭, খন্ড ১৫৭
১৩৫. ইবনুল কাইয়ুম, তুরুকুল হুকমীয়া, মওবা মনীরা, ১৩৭২ হি: পৃষ্ঠা ২৪৫
১৩৬. নেহায়াতুর রাতবা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯।
১৩৭. ড. আবদুল আলী মাহমদ আতু নেজামুল হিসবা ফিল ইসলাম, জামেয়াতুল ইমাম, রিয়াদ পৃষ্ঠা ১৭২
১৩৮. ইবনে তাইমিয়া, হিযবা ফিল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭
১৩৯. মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল, আল-ফারুক ওমর, মাকতাবা নাহদা মিসর, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৮
১৪০. ফতহুল কাদীর খন্ড ৪, পৃষ্ঠা : ২১৪, আলমুগনী, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা : ৩২৪, কাশশাফ আল কেনায়া খন্ড ৬, পৃষ্ঠা : ৩২৪, কাসানী, বেদায়া আন নেহায়া খন্ড ৭, পৃষ্ঠা : ৬৪
১৪১. সূরা আল-বাকারা : ১৬৮

১৪২. মুসনাদ আহমদ, খন্ড ১৯, পৃষ্ঠা: ১৮২
১৪৩. মুসলিম কিতাবুস যাকাত।
১৪৪. সূরা বাকারা : ২৭৫
১৪৫. বুখারী তিরমিযি
১৪৬. সাঈদ হাইযী, আল ইসলাম, দারুল কুতুবুল ইসলমিয়া, ১৯৬৭, খন্ড ২ পৃষ্ঠা: ৯
১৪৭. ড. হাওবা যুহাইলী, পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা ১৩৯
১৪৮. তিরমিযি
১৪৯. সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ।
১৫০. বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ।
১৫১. তিরমিযি, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৪, ই.ফা, বা, ঢাকা।
১৫২. ইবনে মাজা খন্ড : ৩ পৃষ্ঠা ২২
১৫৩. পূর্বোক্ত
১৫৪. ইবনে মাজা, ব্যবসা বাণিজ্য অধ্যায় খন্ড ৩. পৃষ্ঠা ২১ ই. ফা, বা, ঢাকা।
১৫৫. সূরা তাগাবুন : ১৫,
১৫৬. সুনানে ইবনে মাজা কিতাবুল হুদুদ
১৫৭. মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খন্ড ২. পৃষ্ঠা ৫৪
১৫৮. তিরিমিযি, পূর্বোক্ত
১৫৯. পূর্বোক্ত
১৬০. তিরমিযি খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯৭ ই.ফা. বা., ঢাকা
১৬১. আল ইসতিয়াব খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ১১৩
১৬২. তিরমিযি, ইবনে মাজা।
১৬৩. হিদায়া, কিতাবুয়, যাকাত : খন্ড ১
১৬৪. মাআরদী, আল আহকামুস সুলতানিয়া পৃষ্ঠা : ১১৫
১৬৫. সূরা আত তালাক : ২,৩
১৬৬. ইবনে মাজা, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০৯, ই.ফা, বা., ঢাকা।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ- ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৮

আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা (ইসলামী ফিকাহ বিশ্বকোষ)-এর ভূমিকা

॥ দ্বিতীয় কিস্তি ॥

ফিকাহ্-এর মূলনীতিশাস্ত্র علم أصول الفقه

এই শাস্ত্রটি হিজরী দ্বিতীয় শতকে উদ্ভূত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ (জমহুর) আলেমদের মতে, ইমাম শাফেঈ র. সর্বপ্রথম এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। ইবনুন নাদীম তাঁর 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে বলেছেন, আবু হানিফা র. এর সহচর আবু ইউসূফ র. সর্বপ্রথম এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত, এ বিষয়ে আমাদের নিকট সবচেয়ে প্রাচীন যে রচনাটি পৌঁছেছে তা হলো ইমাম শাফেঈ র. এর 'রিসালাহ' নামক গ্রন্থ। এই শাস্ত্র কুরআন, সুন্নাহ ও কিয়াস থেকে শরয়ী বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদের জন্য অবশ্যপালনীয় মূলনীতিসমূহ আলোচনা করে। 'রিসালাহ' গ্রন্থটি ইজতিহাদের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করার জন্যই রচিত হয়েছে। যেকোন শাস্ত্র কিংবা সৃষ্টজীব ক্ষুদ্র অবয়বে জন্ম নেয়, অতঃপর ধীরে ধীরে তা বিরাটাকার ধারণ করে। উসূলুল ফিকাহ শাস্ত্র ও তার বিবর্তনে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করেছে এবং অন্যান্য শাস্ত্রও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, ইজতিহাদের সাথে এসব জ্ঞানও সম্পৃক্ত। একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, এই শাস্ত্র বিভিন্ন মৌলিক চিন্তাধারার আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এ বিষয়ের উপর অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে পরবর্তীতে উসূলুল ফিকাহ সংক্রান্ত বিশেষ পরিশিষ্টে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কেউ যেন এই ধারণা না করেন যে, উসূলুল ফিকাহ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচিত হওয়ার আগে অবশ্য অনুসরণীয় কোন মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা হতো না। বরং বিষয়টি তার বিপরীত। সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর যুগ থেকে উসূলুল ফিকহের গ্রন্থ রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুজতাহিদগণ সুদৃঢ় মূলনীতি অনুসরণ করতেন। যদি কোন ফকীহ্ অন্য ফকীহ্-এর সাথে কোন মূলনীতিতে মতভেদ করতেন, তবে তা ছিল যথাসাধ্য সত্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস এবং প্রবৃত্তিকে বিচারক বানানো ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মনগড়া কিছু বলা থেকে বিরত থাকার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দিকে এই মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে ছিল না সত্য, তবে তা অবশ্যই অনুসরণ করা হতো। উদাহরণ স্বরূপ নাহ্ (আরবী ব্যাকরণ) শাস্ত্রের বিষয়টি চিন্তা করা যায়। নাহ্ শাস্ত্র সংকলিত হওয়ার আগে এর পরিভাষাসমূহ অনুসরণ না করেও আরবী ভাষীগণ আবশ্যিকভাবেই ফায়েল (কর্তা)-কে র'ফা (পেশ) ও মাফউল (কর্ম)-কে নসব (যবর) দিতেন।

এখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, ফিকাহ শাস্ত্র সংকলনের পর উসূলুল ফিকাহ সংকলন করা হয়েছে যদিও অস্তিত্বের দিক থেকে দু'টি শাস্ত্রই যুগপৎ ও সম্পূরক।

এ যুগে অনুমান প্রসূত ফিকাহ الفقه الافتراضي । -এরও উদ্ভব হয়। ফিকহের এই শাখা ইমাম আবু হাননিফা র. ও তাঁর ছাত্রদের কার্যক্রম শুরুর আগেই ইরাকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে প্রসার লাভ করেছিল। যদিও বিষয়টি ইমাম আবু হানিফা ও তার শিষ্যদের যুগে গবেষণার সতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়। ফিকাহর এই শাখাকে কেন্দ্র করে ফকীহগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল এটাকে অপছন্দ করতেন, কেননা তাদের মতে এ নিয়ে ব্যস্ত হওয়া মর্যাদাকর নয়। কখনো কখনো তা বিতর্কের সৃষ্টি করে, যা ঝগড়া বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। অন্য দল এর পৃষ্ঠপোষকতা করে বলতেন, প্রতিটি ঘটিতব্য বিষয়ের বিধান আমাদের প্রস্তুত রাখা উচিত, যাতে তার সম্মুখীন হওয়ার পর তৎসংশ্লিষ্ট বিধান জানতে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে না পড়ি। আর প্রতিটি মতেরই নিজস্ব একটি দৃষ্টিকোণ ও অবস্থান রয়েছে। এখানে আমরা দু'টি মতের মধ্যে তুলনা করতে চাই না। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ফিকাহ্-এর এই শাখায় বাস্তবে প্রকাশ লাভ অসম্ভব এমন কিছু সমস্যা অনুমান করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, স্বভাবত যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া অনুপকারী ও নিষ্ফল। আর আল্লাহ্ নিষ্ফল কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে বাস্তবে প্রকাশলাভ সম্ভব, তবে এখনো উদ্ভূত হয়নি এমন বিষয় অনুমান করে বিধান রচনায় আপত্তি নেই। আমরা ফিকাহ এর কিতাবসমূহে ছড়িয়ে থাকা এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাই, আগেকার যুগের আলেমগণ বাস্তবে যার সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করেছেন, অথচ কার্যত তা ঘটেছে। যেমন পুরুষের নারীতে এবং নারীর পুরুষে রূপান্তর, কৃত্রিম পরাগায়নের মাসআলা, মৃতের অংগ জীবিতের দেহে সংযোজন অথবা জীবিতদের পরস্পরের অংগ প্রতিস্থাপন ইত্যাদি। বস্তুত অনুমান প্রসূত ফিকাহ এ জাতীয় মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে, যা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। এভাবে আগেকার যুগের ফকীহগণ আমাদের জন্য সহজ জীবন পথ প্রস্তুত করে গিয়েছেন।

মুজতাহিদ ও ফকীহগণের স্তর ঃ এই অনুচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে মুজতাহিদদের স্তর বর্ণনা করবো, বিস্তারিত ভাবে নয়। কেননা আইনের বিধিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত ইতিহাস শাস্ত্রে ও 'তাবাকাতুল ফুকাহা' শীর্ষক গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞগণ মুজতাহিদদেরকে নিম্নোক্ত স্তর সমূহে বিন্যস্ত করেছেন।

১. প্রবীণ মুজতাহিদগণ ঃ المجتهدون الكبار । ঃ তাঁরা হলেন বর্তমানে প্রসিদ্ধ ও অনুসৃত মাযহাব এবং বিস্মৃত মাযহাবগুলোর ইমামগণ। মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিলো। যেমন চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও আহ্মদ র.।

পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য মুসলমান উল্লেখিত ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করছেন। এসব ইমাম ছিলেন প্রায় সমসাময়িক এবং তাদের কতকের মাযহাব বিস্মৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা লুপ্ত হয়নি। যেমন সিরিয়ার ইমাম আওযা'ঈ, মিসরের লাইছ বিন সা'দ, ইরাকের ইব্নে আবি-লাইল ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ। খিলাফ (দ্ব্যর্থবোধক হাদীসের সমন্বয়), বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীসসমূহের ভাষ্য সংক্রান্ত তাদের অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে।

২. সহযোগী মুজতাহিদগণ ঃ المجتهدون المنتسبون । ঃ এরা হলেন উল্লেখিত ইমামদের সহচর ও তাঁদের ছাত্রবৃন্দ। তারা তাদের ইমামদের সাথে সূত্র (কাওয়াইদ)ও মূলনীতি (উসূল)-এ একমত, তবে আনুষঙ্গিক

বিষয়ে তাদের সাথে মতভেদ করেন। তাদের অভিমতসমূহ সংশ্লিষ্ট মাযহাবের অভিমত হিসেবে গন্য হয়, যদিও সেই মত মাযহাব প্রবর্তক থেকে বর্নিত হয়নি। যেমন-ইমাম আবু হানীফা র. এর সহচর ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার র.; ইমাম মালেক র. এর সহযোগী আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম ও ইবনে ওয়াহ্হব র. ও ইমাম শাফিঈ র. এর সহযোগী আল-মুযানী র.। তবে ইমাম আহ্মদ র. এর সহযোগীগণ শুধু তাঁর হাদীস ও ফিক্হী অভিমত সমূহের বর্ণনাকারীই ছিলেন, তাদের কেউ তার ইমামের সাথে মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতভেদ করেননি। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর আল-আছরাম, আবু দাউদ আস্-সিজিস্তানী, আবু ইসহাক আল্-হারবী প্রমূখ।

৩. মাযহাব ভিত্তিক মুজতাহিদগণ ঃ مجتهدو المذاهب ঃ তাঁরা মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাদের ইমামদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। কিন্তু ইমামের পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন সব বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করেন যে সম্পর্কে ইমাম ও তাঁদের সহযোগী কোন মত পাওয়া যায় না। কখনো কখনো তারা তাদের ইমামদের সাথে উরফ (প্রচলিত প্রথা) ভিত্তিক বিধানসমূহের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন। এসব বিধান সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'দলিল-প্রমাণের ভিন্নতার কারণে এ মতভেদ তৈরি হয়নি; বরং উরফ ও যুগের ব্যবধানের কারণে হয়েছে। যদি তাদের ইমাম এ সম্পর্কে জানতেন , তবে অবশ্যই শেষোক্তদের অভিমত সমর্থন করতেন।' এরা হলেন সেইসব আলেম যারা মাযহাবের বিষয়সমূহের পর্যালোচনা, তার সূত্রসমূহ (কাওয়াইদ) প্রমান করা, সুবিন্যস্ত করা এবং তার বিভিন্ন অংশকে একত্রে সংকলিত করার ক্ষেত্রে ছিলেন একান্ত নির্ভরযোগ্য।

৪. অগ্রাধিকার প্রদানকারী মুজতাহিদগণ ঃ المجتهدون المرجحون ঃ এদের প্রধান কাজ হচ্ছে, অগ্রাধিকার প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মুতাকদ্দিমদের (পূর্ববর্তী ইমামগণের) প্রবর্তিত মূলনীতি অনুসরণ করে কোন হাদীসকে অপর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। একদল আলেম মুজতাহিদগণের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে একই স্তরভুক্ত করেছেন।

৫. দলীল উপস্থাপক স্তর ঃ طبقة المستدلين ঃ তারা কোন বিধান উদ্ভাবন করেন না, এক মতকে অন্য মতের উপর অগ্রাধিকার দেন না। কোন মতটি সর্বাধিক আমলযোগ্য তাও বর্ণনা করেন না। তারা শুধু বিভিন্ন মতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেন, সেই দলীলের ভিত্তিতে যা নির্ভরযোগ্য তা বর্ণনা করেন এবং কোন বিধানকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কেবল বিভিন্ন দলীলের মধ্যে তুলনা করেন।

সুক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, পূর্বোক্ত দু'টি স্তরের তুলনায় এ স্তরটি কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেহেতু বিধান সমূহের পক্ষে দলীল পেশ করার কাজটি এক মতকে অন্য মতের উপর অগ্রাধিকার প্রদানের কাজ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই একে তুচ্ছজ্ঞান করা সমীচীন নয়।

অতএব এ তিনটি স্তরকে পরস্পরের সহায়ক বলাই উত্তম। এই তিনটি স্তরে যাঁরা মাযহাবের মুজতাহিদ অথবা আহলুত তারজীহ অথবা মুসতাদিল্লীন হিসেবে গণ্য হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ হানাফী মাযহাবের আবু মানসূর আল্-মাতুরীদী, আবুল হাসান আল্-কারখী, আবু বকর আল-জাসসাস আর-রাযী, আবু যায়েদ আদ-দাবূসী, শামছুল আইম্মা

আল্-হালওয়ানী, শামছুল আইম্মা আস-সারাখসী র. প্রমুখ।মালেকী মাযহাবের আবু সাঈদ আল্-বারাদী, আল্-লাখমী, আল্‌বাজী, ইবনে রুশদ, আল-মযেরী, ইবনুল হাজেব, আল্-কারাফী র. প্রমুখ। শাফেরী মাযহাবের আবু সাঈদ আল-ইসতাখরী, আল-কাফ্ফাল, আল কাবীর আশ-শাশী, হুজ্জাতুল ইসলাম, আল্-গাযালী; হাম্বলী মাযহাবের আবু বকর আল্-খাল্লাল, আবুল কাসেম আল্-খারকী, কাযী আবু ইয়া'লা আল্-কবীর র. প্রমুখ।

উল্লেখিত ফকীহ ও মুজতাহিদদের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, ঐতিহাসিকগণ তাঁদের মূল্যায়ন ও স্তর বিন্যাসে মতপার্থক্য করেছেন। কিন্তু তারা এ বিষয়ে একমত যে, শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েলকে সুদৃঢ়করণে এবং এর স্থিতিশীলতা ও ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে তাদের যথার্থ ভূমিকা ও সুদূরপ্রসারী অবদান রয়েছে।

মাযহাবের অনুসারী ফকীহগণ ঃ المقلدون।

তারা মৌলিক কোন ইজতিহাদ করেননি। তবে তাদের বর্ণনা করার যোগ্যতা রয়েছে। তারা দু'ভাগে বিভক্তঃ- (ক) হাফেয শ্রেণী (খ) শুধু অনুসরণকারী শ্রেণী।

(ক) হাফেয শ্রেনী طبقة الحفاظ ঃ তাঁরা মাযহাবের অধিকংশ বিধি-বিধান ও বর্ণনা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাঁরা বর্ণনার ক্ষেত্রে দলীল (হুজ্জত), ইজতিহদের ক্ষেত্রে নন। এছাড়া তাঁরা হাদীস বর্ণনা, তার ব্যাখ্যা প্রদান এবং তারজীহ (অগ্রাধিকার প্রদান) না করলেও অগ্রাধিকার প্রাপ্তির দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী মত বর্ণনার ক্ষেত্রে দলীল হতে পারেন। তাদের সম্পর্কে ইবনে আবেদীন বলেন,'তারা সবচেয়ে শক্তিশালী, শক্তিশালী, দুর্বল এবং জাহিরুর-রিওয়ায়াত, জাহিরুল-মাযহাব ও রিওয়ায়াতুন-নাদিরা এর মধ্যে পার্থক্য করণে যথার্থই সক্ষম।'

উদাহরণস্বরূপ মূল্যবান কিছু পুস্তকের গ্রন্থকার যেমন-আলকানয , তানবীরুল আবসার, আল্-বিকায়া ও আল্-মাজমা' -এর গ্রন্থকারগণ। তাদের অবস্থা এই যে, তাঁরা তাদের কিতাবসমূহে প্রত্যাখ্যাত মতামত ও দুর্বল রিওয়ায়াত সমূহ উদ্ধৃত করেন না। এতদসত্ত্বেও তাদের কাজ 'তারজীহ'-এর পর্যায়ভুক্ত নয় বরং তারজীহ-এর স্তরসমূহ জানা এবং তারজীহদানকারীদের কাজের আলোকে তা বিন্যস্ত করা হলো তাদের কাজ। তারজীহ উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে তারা মতপার্থক্য করেছেন। তাদের একদল শুধু এক মতের উপর অন্য মতের তারজীহ উদ্ধৃত করেন এবং অন্যরা এর বিপরীত করেন। তারা তারজীহ প্রদানকারীদের এমন মতামত গ্রহন করেন, যা অগ্রাধিকার প্রদানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মাযহাবের মূলনীতির ভিত্তিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অথবা মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা অধিক অথবা যিনি মাযহাব সংক্রান্ত বিষয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য।

পূর্বকালের আলেমগণের ন্যায় এদের ফতোয়া বা মত প্রদানের অধিকার রয়েছে, কিন্তু তা পূর্ববর্তীদের তুলনায় ক্ষুদ্র পরিসরে। তাদের সম্পর্কে ইবনে আবেদীন বলেন, "সন্দেহ নেই যে, বিরোধপূর্ণ মাসাআলার মধ্য থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতটি এবং এর স্তরের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া স্বল্প আয়েসে জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য সর্বশেষ আশ্রয়স্থল।"

সুতরাং মুফতী ও কাজীদের দায়িত্ব হলো, শঙ্কামুক্ত হয়ে দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে উত্তর দেয়া এবং হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার মাধ্যমে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা।"১

আমরা দেখতে পাই, এই স্তরে মাযহাবের অভিমতসমূহ সম্পর্কে গবেষণা, সংকলন তৈরি, পুস্তক রচনা ও বিন্যাসের কাজ হয়েছে বিবরণের বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে, দলীল প্রমাণের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।

(খ) অনুসরণকারীগণ المتبعون। ঃ যারা মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়ে অন্যদের (বিশেষজ্ঞদের) অনুসরণ করেন তাদেরকে আল-মুত্তাবিউন (অনুসরণকারী) বলা হয়। ইজতিহাদ, বিভিন্ন মতের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান, দলীল-প্রমাণ পেশ এবং উদ্ধৃতি ও তার শুদ্ধতা সম্পর্কে অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্ববর্তী ফকীহদের অনুসরণ করেন। এরা শুধু তারজীহ (অগ্রাধিকারদান) বিষয়ক পুস্তিকাদি বুঝতে পারেন, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে কোনোটিকে নিজ থেকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন না। তারজীহ এর কোন অধ্যায়েই তাঁরা তারজীহ দানকারীদের সমতুল্য জ্ঞান রাখেন না এবং তাঁরা তারজীহ এর স্তরসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতেও অক্ষম। এদের সম্পর্কে ইবনে আবেদীন বলেন[১]ঃ "তারা দুর্বল ও সবল মতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না, ডান থেকে বাম আলাদা করতে পারেন না। বরং তারা অন্ধের ন্যায় যা পান তা সংগ্রহ করেন। সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা এদের অনুসরণ করে"।

অনুসরণকারী এই শ্রেনীর সংখ্যা ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী যুগসমূহে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা পুস্তকাদির শব্দগুচ্ছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন, সেখান থেকে কিছু গ্রহণের দিকেই তাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকে। তারা যা গ্রহণ করেন তার এবং যার উপর ভিত্তি স্থাপন করেছেন তার অনুকূলে যে দলীল প্রমাণ রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই। বরং তার এটুকু বলেই সন্তুষ্ট থাকেন যে, এখানে এরূপ একটি মত রয়েছে, যদিও তার পক্ষে শক্তিশালী দলীল অনুপস্থিত।[২]

এই শ্রেণীটির ভিন্নধর্মী দু'টি প্রভাব রয়েছে। তার একটি কল্যাণকর, যা বিচার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা যখন বিচারকের রায় অগ্রাধিকারযোগ্য মত ছাড়া সঠিক হতে পারে না, তখন এদের কাজ হলো এই অগ্রাধিকারযোগ্য মতের অনুসরণ করা। এতে যেকোন বাড়াবাড়ি থেকে বিচার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং যুগের বিবর্তনে চিন্তার মধ্যে যে বিকৃতি ঘটে থাকে তা থেকেও একে রক্ষা করা যায়। বিচার বিভাগীয় বিধানাবলীর ক্ষেত্রে কেবল অনুসরণ কল্যাণজনক।

অপরটি ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ফকীহদের অভিমতকে অতিপবিত্র মনে করা এবং দলীল কতোটা শক্তিশালী, কুরআন-সুন্নাহর সাথে বক্তব্যের কতোটা সামঞ্জস্য আছে এবং সেটি বাস্তবায়নযোগ্যতার দিকে না তাকিয়ে তাদের বক্তব্যকে গ্রহনযোগ্য দলীল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে সবকিছু সংশয়িত হয়ে গিয়েছে এবং মনগড়া কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে এর মারাত্মক কু-প্রভাব রয়েছে। ফলে চাটুকার ব্যক্তিগণ অপ্রচলিত মতামত উল্লেখ করে সমাজের সম্পাদশালীর কর্মকান্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসে। অতঃপর এদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে কিছু আলেম যারা এদের ভূমিকা ও কর্মকান্ডকে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়, সেসব মতের প্রবক্তা, তার দলীল, বর্ণনার যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট মাযহাবের পুস্তকাদিতে তার বাস্তবতা যাই থাক না কেন। এরপর এসব চাটুকাররা অধিক জ্ঞানের গর্বের প্রতিযোগিতা করে বিভিন্ন মজলিসে ছড়িয়ে পড়ে। এদের এবং এদের অনুসারীদের জন্য আফসোস! তাদের জন্যও আফসোস, যারা এদের কথাকে দীনের দলীল হিসেবে গ্রহন করে এবং যারা তাদেরকে উৎসাহিত করে তারা হতভাগ্য।[৩]

মুক্ত চিন্তার ইজতিহাদ কিংবা নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক ইজতিহাদের বিভিন্ন যুগে; বরং তাকলীদের যুগেও আমরা এমন কোন ফিকাহ গবেষককে পাইনি যিনি শরঈ বিধান উদ্ভাবনে শরীয়তের দলীল প্রমাণ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করেছেন। বরং তাদের কেউ-ই রোমান আইন কিংবা বিজিত দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন থেকে কিছু গ্রহনের দিকে মনোনিবেশ করেননি।

যারা সন্দেহপোষণ করেন ইসলামী আইনবিদগণ বিধান উদ্ভাবনে রোমান আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের উচিত এমন একটি বিধানের প্রমাণ পেশ করা, যেখানে রোমান অথবা অন্যান্য আইনের উপর নির্ভর করা হয়েছে। যদি রোমান আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ কোন বিধান পাওয়া যায় তার অর্থ এই নয় যে, এটি সেখান থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে; বরং এটি হয়েছে স্বাভাবিক প্রকৃতির মিলের কারনে। পৃথিবীতে অনেক বিধান রয়েছে, যা যুগ ও সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয় না। সংগতিপূর্ণ এসব বিধানের উৎসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে সেটি শরয়ী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। (চলবে)

অনুবাদ ঃ নাজমুল হুদা সোহেল

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল্ ফাতাওয়া আল্ খাইরিয়্যা ২/৩৩

২.ইবনে আবেদীন, রাসমুল মুফ্তী

৩.মাউসূআতুল ফিক্হ আল্ ইসলামী ১/৬৬, জামইয়্যা আদ্ দিরাসাতুল ইসলামিয়্যা

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯-৮০

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ভূমি ব্যবস্থা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের মানবজাতির পথপ্রদর্শক। মহান আল্লাহ প্রথম মানব ও নবী হিসাবে হযরত আদম আ.-কে প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার কার্যের শুভ সূচনা ঘটে এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[১]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁর জীবদ্দশায় একদল যোগ্যতম লোক রেখে যান যাঁরা ইসলামের ইতিহাসে সাহাবী নামে খ্যাত। তবে তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁরা হলেন, হযরত আবূ বকর রা., হযরত 'উমর রা., হযরত 'উসমান রা. ও হযরত 'আলী রা.। মহানবী স. দশ বছর সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর চারজন প্রধান সাহাবী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁদেরকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' (১১/৬৩২-৪০/৬৬১) নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'।[২]

তাঁদের শাসনকাল ছিল ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। তাঁরা মহানবী সা.-এর আদর্শকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করেন এবং টিকিয়ে রাখেন। তাঁরা একাধারে ছিলেন মুজতাহিদ, ন্যায়বিচারক, যোগ্যতম প্রশাসক এবং রণাঙ্গনে সুদক্ষ সেনাপতি। মোটকথা, জীবন, ধর্ম ও রাজনীতির সকল দিক ও বিভাগে তাঁরা ছিলেন মহানবী সা.-এর সত্যিকার সার্থক উত্তরাধিকারী। এটাই ছিল 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' বা নবুওয়াতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত।[৩]

মহানবী সা. এই খিলাফত অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের উপর আমার সুন্নাতের অনুসরণ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ অত্যাবশ্যক।'[৪]

অপর এক হাদীসে আছে, "হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. বলেন, রসূলুলাহ সা. বলেছেন : ...তোমরা যারা জীবিত থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া (বিদ'আত) থেকে দূরে থাকবে। কেননা তা গুমরাহী। তোমাদের কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাত ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। এসব সুন্নাতকে মাড়ির দাঁতের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।"[৫]

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাড্ডা আলাতুন্নেসা স্কুল এণ্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা।

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত ও তাঁদের ত্রিশ বছরের খিলাফতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁদের শাসনকালই খিলাফতে রাশেদা হওয়ার যোগ্য। নবী সা. তাঁদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "খিলাফত ব্যবস্থা ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর তা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে।"[৬]

হাদীস বর্ণনাকারী সাফীনা রা. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "হযরত আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল দুই বছর, হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফতকাল দশ বছর, হযরত 'উসমান রা.-এর বার বছর এবং হযরত 'আলী রা.-এর খিলাফলকাল ছয় বছর-এভাবে মোট ত্রিশ বছর হিসাব করো।"[৭]

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত আলী রা.-এর খিলাফতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে খিলাফতে রাশেদার পবিত্র যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বিশ্বের ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নন, অমুসলিম এমনকি মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালকে মানব ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৮]

খিলাফতের ধারণা

'খিলাফত' শব্দের আভিধানিক অর্থ - প্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কারো স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর 'খলীফা' শব্দের অর্থ - প্রতিনিধি, স্থলবর্তী। 'খলীফা' শব্দের বহুবচন 'খুলাফা' এবং 'খালাইফ'। ইসলামে 'খিলাফত' এমন একটি শাসন ব্যবস্থার নাম যা মহান আল্লাহর বিধান ও মহানবী সা.-এর সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত। এই শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ শাসক। মানুষের মর্যাদা হলো, সে সর্বোচ্চ শাসকের প্রতিনিধি বা খলীফা এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে সর্বোচ্চ শাসকের আইনের অধীন। খলীফার কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা।[৯]

খিলাফত সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের সর্বসম্মত অভিমত ছিল, খিলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কিংবা নেতৃত্ব দেয়া তাদের মতে খিলাফত নয় বরং তা স্বৈরতন্ত্র বা রাজতন্ত্র। খিলাফত ও রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবীগণ পোষণ করতেন, হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে-'ইমামত অর্থাৎ খিলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।'[১০]

ইসলামের এই খিলাফত সর্বজনীন। আল্লাহর এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁদের বিধান ও আইন মান্যকারী সকল মানুষই আল্লাহর দেয়া এই প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকারী। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

'তোমাদের মধ্যে যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন।'[১১]

বস্তুত এই সর্বজনীনতার ভাবই ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পোপবাদ এবং পাশ্চাত্য ধারণা-ভিত্তিক ধর্ম রাষ্ট্র প্রভৃতির পঙ্কিলতা হতে পবিত্র রাখে এবং এক নিখুঁত ও পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যেখানে জনগণকেই নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক বলে মনে করে, সেখানে ইসলাম 'মুসলিম' জনগণকে কেবল খিলাফতেরই অধিকারী বলে অভিহিত করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেও সাধারণ জনগণের ভোট গ্রহণ করা হয় এবং জনমতের ভিত্তিতে এক একটি সরকার চলে। ইসলামী গণতন্ত্রও অনুরূপভাবে মুসলিম জনগণের নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণের পক্ষপাতী। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য ধারণায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সীমাহীন শক্তির মালিক। পক্ষান্তরে ইসলামের ধারণা অনুসারে সর্বজনীন খিলাফত মহান আল্লাহর আইনের অনুসরণকারী মাত্র।[১২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইসলামের উৎসমূলে খিলাফত কথাটির সাথে ইমামত কথাটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামী সরকার ব্যবস্থাপনায় কখনো খলীফা, কখনো ইমাম, কখনো আমীর ইত্যাদি কথা প্রযুক্ত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এবং মণীষী আল-মাওয়ার্দী প্রমুখও কখনো খিলাফত ও খলীফা আবার কখনো বা ইমামত ও ইমাম শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১৩]

খুলাফায়ে রাশেদীন

ইসলামে নবুওয়াতের পর এই খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ। বস্তুত ইসলামে খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধান এরই ভিত্তিতে হয়ে থাকে। রাসূলের কার্যাবলীকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ হতে তা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সাহাবা কিরামের ক্ষেত্রে খিলাফতের প্রশ্নে দু'টি চিন্তাধারা উদ্ভব হয়। একটি চিন্তাধারা অনুযায়ী মহানবী সা.-এর প্রতিনিধিত্বের পদ বা মর্যাদা 'খাস' (বিশেষ) হিসেবে গণ্য। যেমন ইসলামের প্রথম চার খলীফাকে খুলাফায়ে খাস বলা হয়। অন্য চিন্তাধারা অনুযায়ী এই মর্যাদা কোন বিশেষ মর্যাদা নয়, বরং এ মর্যাদা আম (সাধারণ) মর্যাদা। এটা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. (জ. ১৭০৩, মৃ. ১৭৬২)-এর অভিমত। আর প্রতিটি মুসলিম যিনি প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী তিনিই খলীফা হতে পারেন। তবে কুরআন ও হাদীস হতে খলীফার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, সে আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'খুলাফায়ে রাশেদীন' ই ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।[১৪]

খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা

মহান আল্লাহ মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রসূল প্রেরণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁদের শ্রেষ্ঠতম। তিনি তাঁর আনীত আদর্শ দ্বারা জগতের শ্রেষ্ঠ একদল মানুষ

বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পেরেছিলেন। 'খুলাফায়ে রাশেদীন' তাঁদের অন্যতম। মহানবী সা.-এর পর এই চারজন সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের খিলাফতকাল আলোচনার পূর্বে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী সা. -এর মুখ নিসৃত পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করা হলো।

* হযরত আবদুলাহ ইব্‌ন 'উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর যামানায় আমরা লোকদের মধ্যে পরস্পরকে প্রাধান্য দিতাম। আমরা হযরত আবূ বকর রা.-কে সবার উপরে প্রাধান্য দিতাম। তারপর হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে এবং অতঃপর হযরত 'উসমান ইবনে আফফান রা.-কে।[১৫]

* মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়া র. বলেন, "আমি আমার পিতা (আলী রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সা.-এর পর কোন্ ব্যক্তি সকলের চেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, হযরত আবূ বকর রা.। তিনি বলেন, আমি বললাম: অতঃপর কে? তিনি বললেন, হযরত 'উমর রা.। আমার আশংকা হল, এবার (জিজ্ঞেস করলে) তিনি হযরত 'উসমান রা.-এর কথা বলবেন। আমি তাই বললাম, অতঃপর আপনিই তো (উত্তম)। তিনি বললেন, আমি তো অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় একজন মুসলমান মাত্র।"[১৬]

* হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক রা. বলেন, "নবী সা. একবার হযরত আবূ বকর, হযরত 'উমর ও হযরত 'উসমান রা. সহ উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদের নিয়ে (আনন্দে) দুলতে থাকে। তখন নবী সা. বললেন, 'উহুদ স্থির থাক। কেননা তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ আছেন।"[১৭]

* হযরত যাইদ ইব্‌ন আসলাম রা. তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, ইব্‌ন 'উমর রা. আমাকে হযরত 'উমর রা.-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বললাম: "নবী সা.-এর ইন্তিকালের পর আমি হযরত 'উমর রা.-এর চেয়ে অধিক পূণ্যবান ও শ্রেষ্ঠ দাতা আর কাউকে দেখিনি। এমনকি (বলতে গেলে) এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে।"[১৮]

* হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, নবী সা. বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কিছু লোক ইলহাম প্রাপ্ত ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে সে হবে 'উমর।"[১৯]

হযরত 'উকবা ইব্‌ন আমীর রা. বলেন, নবী সা. বলেছেন, "আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে 'উমর ইবনুল খাত্তাবই নবী হতো।"[২০]

* হযরত 'আলী রা. বলেন, নবী সা. বলেছেন, "হযরত আবূ বকর এবং হযরত 'উমর রা. নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পৃথিবীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত জান্নাতবাসী বয়স্ক লোকদের সর্দার হবেন।"[২১]

* হযরত তালহা ইব্‌ন 'উবাইদুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, (জান্নাতে) প্রত্যেক নবীরই একজন করে অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে। আর জান্নাতে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে 'উসমান।[২২]

* হযরত ইব্‌ন 'উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় আমরা হযরত আবূ বকর, হযরত 'উমর ও হযরত 'উসমান রা. কে গণ্যমান্য লোক বলতাম।[২৩]

* হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. 'আলী রা.-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হযরত মূসা আ.-এর নিকট হযরত হারুন আ.-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমিও আমার নিকট সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত। তবে আমার পরে কোন নবী নেই।[২৪]

হযরত 'আলী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমি জ্ঞানের ঘর (বিদ্যালয়) আর 'আলী হলো সেই ঘরের দরজা।"[২৫]

* হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "মুনাফিক 'আলীকে ভালবাসে না এবং মু'মিন 'আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না।"[২৬]

* হযরত 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ রা. বলেন, নবী সা. বলেছেন, আবূ বকর জান্নাতী, 'উমর জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ জান্নাতী, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইব্‌ন যাইদ জান্নাতী এবং আবু 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. জান্নাতী।[২৭]

* হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. এক মহিলার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "যদি তুমি আমাকে না পাও, তবে আবূ বকর -এর কাছে এসো।"[২৮]

* হযরত হুযাইফা রা. বলেন, রসূলুলাহ সা. বলেছেন, "আমার পরে তোমরা লোকদের মধ্যে আবূ বকর ও 'উমরের অনুসরণ করবে।"[২৯]

* হযরত 'আয়েশা রা. বলেন, রসূলুলল্লাহ সা. বলেছেন, "কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবূ বকর উপস্থিত থাকতে অন্য কারো তাদের ইমামতি করা বাঞ্ছনীয় নয়।"[৩০]

হযরত ইব্‌ন 'উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "মহান আল্লাহ 'উমরের মুখে ও অন্তরে সত্যকে স্থাপন করেছেন। ইব্‌ন 'উমর রা. বলেন, জনগণের সামনে কখনো কোন বিষয় উদ্ভূত হলে লোকেরাও তৎসম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করত এবং 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও অভিমত ব্যক্ত করতেন। দেখা যেত, 'উমর রা.-এর অভিমত অনুযায়ী কুরআন নাযিল হয়েছে।"[৩১]

খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য

খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছরকালীন শাসনকাল (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর্যালোচনা করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানবজাতিকে বিমোহিত করে তা হচ্ছে :

(ক) খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনাদর্শ উজ্জ্বল অনির্বাণ প্রদীপে পরিণত হয়েছিল এবং সমগ্র পরিমণ্ড লকে তা নির্মল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। খলীফাগণের প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় তার গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চারজন খলীফাই মহানবী সা.-এর প্রিয়পাত্র ও বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হযরত 'আলী রা. ব্যতীত আর তিনজন খলীফাই মহানবী সা.-এর দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদীনায় রাজধানী রেখেই খিলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন।

(খ) খিলাফতে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত কোন খলীফার বংশগোত্র কিংবা পরিবার ভিত্তিক অধিকার, উত্তরাধিকার প্রাধান্যের কোনই অবকাশ ছিল না। তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা অধিক আস্থাভাজন। আধুনিক কালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন হলেও তখন কেবলমাত্র তাঁরাই যে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হতেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

(গ) খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন রচনার ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যেত না, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে সুষ্ঠু সমাধান বের করার চেষ্টা করা হতো এবং এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'য় পারদর্শী প্রতিটি নাগরিকেরই মতামত দেয়ার সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল।

(ঘ) খুলাফায়ে রাশেদীন অধিকাংশ ব্যাপারেই প্রবীণ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। সাধারণ ব্যাপারে তাঁরাই মনোনয়ন অনুযায়ী মজলিসে শূরার সদস্য নিযুক্ত হতেন। তবে রায় দানের অধিকার কেবলমাত্র নিযুক্ত সদস্যদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না।

(ঙ) খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাজকীয় জাঁকজমক ও শান-শওকতের কোন স্থান ছিল না। খলীফাগণ সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় জীবন-যাপন করতেন। তাঁদের কোন দেহরক্ষী ছিল না। লোকজন যখন ইচ্ছা খলীফার নিকট উপস্থিত হতে পারতো।

(চ) খুলাফায়ে রাশেদীন বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারকে জাতীয় সম্পদ ও আমানত মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মঞ্জুরী ব্যতীত নিজের জন্য কানাকড়ি সম্পদও কেউ ব্যয় করতে পারতেন না।

(ছ) তাঁরা নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করতেন। কোন ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদেরকে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা করতেন না। তাঁরা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জননেতা ছিলেন না, নামায ও হজ্জ প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারেও যথারীতি তাঁরাই নেতৃত্ব দিতেন। মোটকথা, ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং ধর্মীয় কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজে দ্বৈতবাদ যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অনুরূপভাবে এতদুভয়ের একত্রীকরণ ও সর্বতোভাবে একমুখীকরণই ছিল খিলাফতে রাশেদার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৩২]

হযরত আবূ বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, "হে মানব মণ্ডলী! আমি আপনাদের খলীফা নির্বাচিত হয়েছি, অথচ আমি আপনাদের কারো অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আমি ভালো কাজ করলে সহযোগিতা করবেন। আর মন্দ কাজ করলে সহজ সরল পথে দাঁড় করে দিবেন। সত্য হল আমানত এবং মিথ্যা হল খিয়ানত। আপনাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল যতক্ষণে আমি তার অধিকার পাইয়ে দিতে না পারি। আর আপনাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ না আমি তার নিকট থেকে অপরের অধিকার তুলে নিয়ে আসতে পারি। আপনাদের কেউ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজ ছেড়ে দিবেন না, এরূপ করলে সে জাতিকে আল্লাহ অপছন্দ করবেন। কওমের ভেতরে অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো যাবে না, তাহলে সকলের উপর আল্লাহ বিপদ চাপিয়ে দিবেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। আপনারা নামায আদায় করবেন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।"[৩৩]

হযরত 'আতা ইব্ন সায়িব সূত্রে মুহারিব ইব্ন দিসার র. বলেন, হযরত আবূ বকর রা. যখন খিলাফতের মসনদে সমাসীন হন তখন তিনি 'উমর ও আবূ 'উবায়দা ইব্নুল জাররাহ রা.-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমার সাহায্যকারী প্রয়োজন। হযরত 'উমর রা. বললেন, আমি বিচার ফয়সালার জন্য যথেষ্ট। আবূ 'উবায়দা রা. বললেন, আমি বায়তুল মালের জন্য উপযুক্ত।[৩৪]

অতঃপর তারা দু'জন এ পদে তাঁর খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত বহাল ছিলেন।

হযরত আবূ বকর রা.-এর খিলাফতকালীন ভূমি ব্যবস্থা

(১৩ রবিউল আউয়াল, ১১ হি./জুন ৬৩২ খ্রি. থেকে ২১ জুমাদাল উখরা,১৩ হি./ আগস্ট ৬৩৪ খ্রি.)

হযরত আবূ বকর[৩৫] রা. ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলীফা। মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়ে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মিথ্যা নবুওয়ত দাবিদারদের বিদ্রোহ, যাকাত অস্বীকারকারীদের ত্রাস এবং ইসলাম ত্যাগকারীদের অরাজকতা-এই তিনটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ২ বছর ৩ মাস ১১ দিন।[৩৬]

কিন্তু এই অল্প সময়ের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ধর্ম ত্যাগীদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকতে হয়। শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও মহানবী সা.-এর আদর্শকে যথাযথভাবে সমুন্নত রাখা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের কলেবর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজয়ের ধারাবাহিকতার শুভ সূচনা করেন, যা হযরত ‘উমর রা.-এর খিলাফতকালে পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর যুগ ছিল প্রধানত বৈদেশিক বিজয় সূচনার যুগ। এ জন্য তাঁর শাসনের গন্ডি আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করতে হবে।[৩৭]

মক্কা বিজয়ের পরই মহানবী সা. জনগণের একজন নন্দিত রাষ্ট্রনায়ক এবং রাজনৈতিক ও সমাজ নেতা হিসাবে বিবেচিত হন। মক্কা বিজয়ের পর আরবের অধিকাংশ অঞ্চলের লোকজন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণে এগিয়ে আসে। সমগ্র মরু আরবের গোত্রগুলো থেকে মহানবী সা.-এর নিকট প্রতিনিধি দল আসতে শুরু করে। পূর্বে যারা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি সেই আরবরা মহানবী সা.-কে কেন্দ্র করে সমবেত হতে থাকে। তিনি হন তাদের নবী এবং রাষ্ট্র প্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মহানবী সা.-বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। আরবরা তাঁকে নবী, শাসক এবং সেনাপতি হিসাবে মেনে নেয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী রাষ্ট্র, যার রাজধানী হয় ‘মদীনাতুন্নবী’। রাজধানী থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হতে থাকে প্রতিনিধি অথবা গভর্ণর। মহানবী সা. গোত্রগুলোর জন্য ‘শেখ’ নিয়োগ করেন অথবা তাদের নিজ নিজ গোত্রপতিকেই তাদের গোত্রপতি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। যাকাতদানে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানকে যাকাত প্রদান করতে হতো। এ যাকাত রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগকৃত আদায়কারী দ্বারা আদায় করা হতো এবং আদায়কৃত সম্পদ মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হতো। কুরআন নির্দেশিত বিভিন্ন খাত মোতাবেক মহানবী সা.-এ সম্পদ ব্যয় করতেন।

একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর এ রাষ্ট্র ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আবূ বকর রা. ক্ষমতায় এসে সামনে পেলেন একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের নমুনা। রাষ্ট্রকে সুসংহত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি এ রাষ্ট্রের প্রভূত উন্নতি করেন এবং সারা দেশের বিশৃংখলা শক্ত হাতে দমন করেন।[৩৮]

মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের সংবাদে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করে, কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, সর্বোপরি কিছু লোক নবুওয়ত দাবী করে বসে।[৩৯] রাজধানী মদীনা থেকে যে সব অঞ্চল দূরে ছিল সেসব অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা স্বঘোষিত ভন্ড নবীদের নেতৃত্বে সমবেত হয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

হযরত আবূ বকর রা. তাদের পরাস্ত করে মদীনাকে নিরাপদ রাখেন। বিদ্রোহী গ্রুপ দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল ভন্ড নবী মুসায়লামা, তুলাইহা, সাজাহ প্রমুখের নেতৃত্বাধীন। অন্য দল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা যুক্তি দেখায় যে, মহানবী সা.-এর নিকট যাকাত প্রদান ঠিক ছিল। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর তারা স্বাধীন এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য এখন যাকাত প্রদানে বাধ্য নয়। খলীফা হযরত আবূ বকর রা. উভয় দলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেন এবং একে একে তাদেরকে পরাস্ত করে রাষ্ট্রে শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন।[৪০]

মুরতাদদের[৪১] (ধর্মত্যাগী) দমন পূর্বক তাদের হাতে যে সমস্ত জমি-জমা ছিল, সেগুলোর অধিকার তিনি বাতিল করে দেন। মুরতাদরা পরাস্ত হবার পর দেশে শান্তি ফিরে আসে। বনূ সা'লাবা এবং মদীনার নিকটবর্তী আবরাক এলাকার অধিবাসীরা বসতি স্থাপনের জন্য ফিরে এলে দখলকারীরা তাদের বাঁধা দান করে। ফলে তারা হযরত আবূ বকর রা.-এর কাছে নিবেদন করে, 'কেন আমাদেরকে নিজেদেরই জায়গায় বসতি স্থাপনের জন্য বাঁধা দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যে কথা বলছ? ঐ এলাকায় এখন তোমাদের কোনই অধিকার নেই। বর্তমানে আমিই তার মালিক। তিনি তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করে আবরাক এলাকাকে মুসলমানদের চারণভূমিতে পরিণত করেন।[৪২]

ইরাকের কিছু এলাকা হযরত আবূ বকর রা.-এর সময়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে। কিন্তু ঐ ভূমির উপর এককালীন কিছু কর আদায় ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন প্রকার কর ধার্য করা হয়নি।[৪৩]

মূলত মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর রা.-এর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আবদান হল মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। আরবের বিদ্রোহসমূহ নির্মূল করা। রাষ্ট্র ও সরকারকে তিনি এমন মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার ফলে মুসলমানরা ইরান ও রোমের মত দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহসী হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়।[৪৪]

হজরত 'উমর রা.-এর যুগে ভূমি ব্যবস্থা

(২৩ জুমাদিউস সানী, ১৩ হিজরী/২৪ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রি, থেকে ২৬ যিলহজ্জ, ২৩ হিজরী/৩ নভেম্বর, ৬৩৪ খ্রি.)

মহানবী সা. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে সেখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। তিনি তদানিন্তন জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি সনদ উপহার দেন। ইসলামের ইতিহাসে তা মদীনা সনদ[৪৫] নামে খ্যাত। তিনি এই সনদের মাধ্যমে তৎকালীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহৎ ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মদীনাকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ঘোষণা করে একাধারে তার রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান বিচারপতি ও প্রধান সেনাপতি পদে বরিত হন। তাঁর প্রবর্তিত কল্যাণ রাষ্ট্রে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে বিশাল অবদান রাখেন খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় মহান খলীফা হযরত 'উমর রা. তাঁদের অন্যতম।

হযরত 'উমর[৪৬] রা. মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী। তিনি মহানবী সা.-এর সাথে প্রায় সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কোন কোন যুদ্ধে তিনি সেনাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৪৭] তিনি মহানবী সা.-এর মন্ত্রী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেন, মহানবী সা. বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই আসমানবাসীদের থেকে দু'জন মন্ত্রী এবং যমীনবাসীদের থেকে দু'জন মন্ত্রী ছিল। আসমানবাসীদের থেকে আমার দু'জন মন্ত্রী হলেন হযরত জিব্রাঈল ও হযরত মিকাঈল আ. এবং যমীনবাসীদের থেকে আমার দু'জন মন্ত্রী হলেন আবূ বকর ও 'উমর রা.।[৪৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, হযরত 'উমর রা.-কে যখন (শাহাদতের পর) খাটিয়ায় রাখা হয় তখন তাঁর খাটিয়া মাথায় তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা চারদিক থেকে তাঁর লাশ মুবারক ঘিরে রাখে এবং তাঁর গুণগান বর্ণনা ও দু'আ করতে থাকে। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, আমিও তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার কাঁধের উপর হাত রাখতেই আমি চমকে উঠলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি হযরত 'আলী রা.। তিনি হযরত 'উমর রা.-এর জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করছিলেন এবং বলছিলেন, (হে 'উমর), আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন লোক আপনি রেখে যাননি, যার অনুরূপ আ'মল করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আল্লাহর শপথ! আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে আপনার সঙ্গীদের সাথে রাখবেন। আমার মনে পড়ে, আমি মহানবী সা.-কে প্রায়ই এ কথা বলতে শুনতাম, আমি, আবূ বকর ও 'উমর (অমুক স্থানে) গিয়েছি। আমি, আবূ বকর ও 'উমর (অমুক স্থানে) প্রবেশ করেছি। আমি, আবূ বকর ও 'উমর (অমুক কাজে) বের হয়েছি।[৪৯]

হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফতকাল ইসলামের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। যে সব রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় সেখানে ইসলামী অর্থনীতি অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং ইসলামের মৌলিক কাঠামোর আওতায় বিচিত্রধর্মী আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহও যথাসম্ভব অক্ষুন্ন থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং ভূমি ব্যবস্থায় আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ভূমি, শ্রম, সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় - উপকরণের সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব তথা ভূমি সমস্যার সকল বাঁধন ছিন্ন হয়ে দ্রুত রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। জনগণের জীবনে আসে সত্যিকারের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। মূলত হযরত 'উমর রা. এমন একটি ভূমি ব্যবস্থা উপহার দিয়েছিলেন যা সমকালীন জাতিসমূহের মধ্যকার সবচেয়ে অনুন্নত একটি জাতির ভূ-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে তাকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে এনে দিয়েছিল।

হযরত আবূ বকর রা.-এর ইন্তিকালের পর হযরত 'উমর রা. খলীফার আসনে সমাসীন হবার পর নগরের পর নগর এবং শহরের পর শহর মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। দশ বছর পর যখন মুগিরা ইব্‌ন শুবা'র খ্রিষ্টান কৃতদাস আবূ লু'লু ফিরোজ কর্তৃক হযরত 'উমর রা. শহীদ হলেন তখন ইরান, সিরিয়া এবং মিশর বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়েছিল।[৫০]

হযরত 'উমর এর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল দ্রুতবেগে। এ সাম্রাজ্যের অধিকারে এসেছিল প্রচুর কৃষি জমি। নতুন নতুন কৃষিভূমি মুসলমানদের করতলগত হওয়ায় একটি নতুন ভূমি ব্যবস্থা তৈরীর প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অর্থনীতিতে কৃষির মৌলিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে মালিকানা সমস্যা, ভূমিকর এবং খাজনা ইত্যাদি জাতির ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল বিধায়

ভূমি-ব্যবস্থা, শ্রেণী বিভাজন, প্রশাসনের স্বরূপ, অর্থনৈতিক নিয়ম নীতি ইত্যাদির গতিধারাও নির্ধারণ করতে হয়েছিল।[৫১]

ভূমি সংস্কারে অবদান

যে সময় আরবের চতুর্দিকে প্রচলিত ভারসাম্যহীন ভূমি ব্যবস্থা এমন এক ভূমিমালিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল যারা নতুন রাষ্ট্রের বিকাশমান অর্থনীতির জন্য ছিল পরগাছাস্বরূপ, যখন ভূমিতে সামন্ত প্রথার প্রচলন এবং স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময় হযরত 'উমর রা. ভূমিতে অত্যাচারী ভূমি মালিকদের মালিকানা বিলুপ্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি-ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনে এক বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি ব্যবস্থায় সামগ্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন।[৫২]

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমির প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। ভূমির যাবতীয় সামগ্রী জনগণের ব্যবহারের জন্য এবং প্রত্যেক নাগরিক ভূমি থেকে তার খাদ্য পাওয়ার অধিকারী। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না এবং এ ব্যাপারে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্যও দেয়া যায় না। কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা জাতিকে উৎপাদনের কোন একটি অথবা কতিপয় উপাদান ব্যবহারে অথবা জীবিকার জন্য কোন পেশা গ্রহণে বিরতও রাখা যায় না। অনুরূপভাবে এমন কোন বৈষম্যও সৃষ্টি করা যায় না যার দ্বারা উৎপাদনের উপাদানগুলোতে কোন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী অথবা পরিবারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৫৩]

তাই, মালিকহীন ভূমির অপব্যবহার রোধে হযরত 'উমর রা. হযরত 'আয়শা রা. কর্তৃক বর্ণিত মহানবী সা. এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন, "মালিক বিহীন অনাবাদী জমি যে চাষ করেছে তাতে তারই রয়েছে অধিকার"[৫৪] মহানবী সা.-কর্তৃক যে জমি তার হস্তগত হয়েছিল তিনি তা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের দখলে বিপুল ভূ-সম্পত্তি আসতে থাকায় হযরত 'উমর রা.-এর ভবিষ্যত নির্ণয়ে মহানবী সা.-এর প্রতিটি বাণীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। মহানবী সা. বিজিত ভূমি সৈনিক এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এ আদর্শের ধারাবাহিকতা হযরত আবূ বকর রা. বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত 'উমর রা. রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যতের চিন্তা সর্বোপরি যুদ্ধ জয়ের সময় সামন্ত প্রথা অক্ষুণ্ন থাকবে এ আশংকা করে উক্ত নিয়মে পরিবর্তন আনেন।[৫৫]

হযরত 'উমর রা.-এর খিলাফতের প্রাথমিক পর্যায়ে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোন জটিলতার উদ্ভব না হলেও বিজিত ভূখন্ডের ভূমি বণ্টন নিয়ে প্রশ্ন উঠে। তদানীন্তন প্রথা অনুসারে ভূমি আংশিকভাবে বণ্টিত হতো সেনানায়ক এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে, আংশিক সংরক্ষণ করা হতো রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি হিসাবে এবং আংশিক দেয়া হতো গির্জাকে। মূল মালিকরা সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে নিছক চাষী বা ভূমিদাসে পরিণত হতো। নতুন জমির মালিকানা চলে যেত নতুন লোকের হাতে। কোন নতুন মালিক জমি বিক্রয় করলে চাষীও ক্রেতার সাথে হস্তান্তরিত হয়ে যেত।[৫৬] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইরানে তাদেরকে বিক্রিত ভূমিতে বেঁধে রাখা হতো। তাদের কাছ থেকে সব ধরণের শ্রম এবং সকল প্রকার অসম্মানজনক সেবা আদায় করা হতো। দাস এবং প্রভুর মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক থাকে ভূমি শ্রমিক এবং

ভূমি মালিকদের মধ্যেও বিরাজিত সম্পর্ক অনুরূপই ছিল। ক্রমবর্ধমান করের বোঝা তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। নিঃস্ব হয়ে এবং সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে বিপুল সংখ্যক ভাগ্যাহত কৃষক পেশা ত্যাগ করে ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রোমের অবস্থাও ছিল একই। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এ নৃশংস অবস্থার অবসান ঘটান।[৫৭] হযরত 'উমর রা. তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা অনুধাবন করলেন যে, যদি মুসলিম বাহিনীর সেনাদেরকে হাজার হাজার বর্গমাইল ভূখন্ড দেয়া হয় তাহলে একদিকে সম্পদ মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের কুক্ষিগত হবে যা কুরআনুল কারীমের নির্দেশের পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন,

"তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর।"[৫৮]

অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মাত্র এক পঞ্চমাংশ ভূখন্ড এবং মুসলিমদের দেয় যাকাত দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না। শুধুমাত্র মুসলিম বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার ভূখন্ডসমূহ বন্টন করে দেয়া হলে তাদের লক্ষ্য সঠিক উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হবে এবং তাদের সম্মিলিত শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তাই হযরত 'উমর রা. সিদ্ধান্ত নিলেন, বিজিত ভূখন্ড কেবলমাত্র উপস্থিত লোকদের জন্যই নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তারাও এর মালিক হবে। এ জন্য সমস্ত ভূখন্ড ওয়াক্ফ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে থাকবে।[৫৯]

ইরাক বিজয়ের পর সেনাপতি হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাছ রা.-এর নিকট সৈন্যরা বিজিত ভূমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার অনুরোধ করলে সা'দ রা. বিষয়টির প্রতি হযরত 'উমর রা.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরত 'উমর রা. জবাবে বললেন ঃ "তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি লিখেছ যে, মুসলমানরা গণিমতের মাল ছাড়াও যুদ্ধে অধিকৃত এলাকার ভূ-সম্পত্তি এবং বাসিন্দাদেরকে পর্যন্ত নিজেদের মাঝে বন্টন করে নিতে চাচ্ছে। আমার চিঠি পাওয়ার পর তোমাদের শিবিরে শত্রুদের থেকে অধিকৃত যে সকল প্রাণী ও মালামাল পাবে তা থেকে খুমুস অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রীয় অংশ) পৃথক করে রেখে অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। আর বিজিত ভূমি, নদী-নালা, কৃষকদের হাতে কৃষিকাজের জন্য ছেড়ে দাও। কেননা এ থেকে যে খারাজ আদায় হবে তদ্বারা মুসলমানদের বেতন ও ভাতা আদায় করা যাবে। আর যদি আমরা এ ভূমি সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেই তবে অনাগত বংশধরদের জন্য আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।[৬০]

মিসর বিজয়ের সময়ও একই বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল। মিসর বিজয়ী হযরত 'আমর ইবনুল 'আস রা.-এর নিকট লোকেরা দাবী করল বিজিত ভূমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার জন্য। হযরত 'আমর রা. হযরত 'উমর রা.-এর পরামর্শ চাইলেন। ইমাম আবূ ইউসূফ র. প্রদত্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ রা., হযরত বেলাল রা. সহ আরও কতিপয় মহান ব্যক্তিত্ব নিজেদের মধ্যে ভূমি বন্টনের পক্ষে মত প্রকাশ করার কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে হযরত 'উমর রা. আনসারদের মধ্য হতে ১০ জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে ডেকে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যারা বলে আমি তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি, ঐ সব লোকের বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। আমি মনে করি কিসরার (খসরুর) ভূমির পর আমাদের আর কোন ভূমি অবশিষ্ট থাকবে না। মহান আল্লাহ

আমাদেরকে তাদের ভূমি এবং গণিমত হিসাবে সম্পদ দান করেছেন। আমি ধন-রত্ন মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছি। কিন্তু আমি আশা করছি ভূমি চাষীদের নিকটই ভূমি রেখে দেয়া হবে, এসব ভূমির জন্য তাদের উপর খারাজ এবং জিযিয়া আরোপ করা হবে; যা দিয়ে সেনাবাহিনী, মুসলমানদের শিশু এবং ভবিষ্যত বংশধরদের ব্যয়ভার বহন করা হবে। আপনারা সীমান্ত দেখেছেন, এগুলো রক্ষা করার জন্য আমাদের সৈন্যের দরকার , আপনারা বড় বড় নগর দেখেছেন, এগুলো রক্ষার জন্য একটি বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী প্রয়োজন। যদি আমি বিজিত ভূমি বিলি-বন্টন করে দেই তবে এসব ব্যয় কিভাবে বহন করা হবে?[৬১]

বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বিজিত ভূমি বিলি বন্টন করে দেয়ার ব্যাপারে হযরত 'উমর রা.-এর অস্বীকৃতি ছিল ঐ সমস্ত এলাকায় জমিদারী উচ্ছেদের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মহানবী সা. বিজিত ভূমি (যেমন খায়বরের জমি) মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু ঐ সব ভূমির পরিমাণ এতই কম ছিল যে, সেখানে জমিদারী প্রথার উদ্ভবের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইরাক এবং সিরিয়া বিজয়ের পর তা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হলে সেখানে অবশ্যই যাবতীয় ক্ষতিকারক দিকসহ জমিদারী প্রথার বিকাশ ঘটতো।[৬২]

সরকারী ভূমি রক্ষার ক্ষেত্রে হযরত 'উমর রা. ছিলেন সদা সতর্ক। কোন মুসলমান যদি এ ধরণের ভূমি ক্রয় করে সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করত তাহলে তিনি ঐ সব ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল ঘোষণা করতেন। হযরত আবূ 'উবায়েদ র. বর্ণনা করেছেন 'উৎবা ইব্ন ফারকাদ ফোরাতের তীরে কিছু জমি ক্রয় করেছিলেন। হযরত 'উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার নিকট হতে তুমি এ জমি ক্রয় করেছ? উত্তরে উৎবা বললেন, এর মালিকের নিকট হতে।' হযরত 'উমর রা. তাঁর চারদিকে উপবিষ্ট মুহাজির এবং আনসারদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এরা হল মালিক, তুমি কি তাদের নিকট থেকে কিনেছ? উৎবা না সূচক উত্তর দিলে হযরত 'উমর রা. বললেন, 'তাহলে যাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছ তাদেরকে জমিটি ফিরিয়ে দিয়ে তোমার টাকা ফিরত নিয়ে নাও।[৬৩]

হযরত 'উমর রা. ছিলেন ন্যায়ের প্রতীক। তিনি জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুষ্টিমেয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি প্রদান করার বিরোধী ছিলেন।এতে তিনি গণ অধিকারকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়ার শামিল বলে মনে করতেন। এ ব্যাপারে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর রা.-এর মতামতও সংশোধন যোগ্য বলে তিনি মনে করতেন। একদিন আকরা ইব্ন হারিস ও উয়াইনা ইব্ন হিস্ন আল ফাযারী রা. হযরত আবূ বকর রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি পতিত জমি তাদেরকে প্রদান করার অনুরোধ করেন। তিনি তাদের বক্তব্য শুনে প্রার্থিত জমি বরাদ্দ দেন। খলীফার নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্য তারা হযরত 'উমর রা.-এর নিকট আসেন। তিনি তাদের হাত থেকে নির্দেশনামা নিয়ে মুচড়িয়ে এর লেখাগুলোকে ঘষে ফেলে বললেন, ইসলাম যখন দুর্বল ছিল মহানবী সা. তোমাদের মন জয় করার জন্য এরূপ করতেন, এখন ইসলাম শক্তিশালী, কাজেই তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না। এ অবস্থা অবলোকন করে তাঁরা হযরত আবূ বকর রা.-এর নিকট চলে যান এবং জানতে চান, খলীফা কি আপনি না হযরত 'উমর রা.? হযরত আবূ বকর রা. বলেন, খলীফা হযরত 'উমর রা.-ই হতেন, যদি তিনি ইচ্ছা করতেন। ইতোমধ্যে হযরত 'উমর রা.-খলীফার নিকট উপস্থিত হয়ে যুক্তি দিয়ে

বলার পর হযরত আবূ বকর রা. স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন এবং হযরত 'উমর রা.-এর সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।"[৬৪]

হযরত 'উমর রা. দেশের প্রতি ইঞ্চি জমির সদ্ব্যবহার করতেন। ইয়ামেন, নজদ, তায়েফ এবং মদীনাতে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের প্রতি কৃষি ভূমির যথাযথ ব্যবহার করার তাঁর নির্দেশ ছিল। তিনি ঐ সমস্ত জমি সরকারের অধীনে নিয়ে আসতেন যেগুলো বিনা চাষে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকতো। হযরত বেলাল ইব্‌ন হারিস আল মুযনি র.-কে মহানবী সা. আকিক উপত্যকায় এক খন্ড ভূমি উপহার দিয়েছিলেন। নানা কারণে তা তাঁর পক্ষে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়নি। হযরত 'উমর রা. তাঁকে যতটুকু জমি চাষাবাদ সম্ভব তা রেখে বাকী অংশ ফেরত দিতে বলেছিলেন। হযরত বেলাল রা. তাতে রাযী না হওয়ায় হযরত 'উমর রা. তা ফেরত নিয়েছিলেন।[৬৫]

কৃষি উন্নয়ন

ভূমির উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। একটি দেশ ও জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই হযরত 'উমর র. সামগ্রিকভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত চাষীকুলের অবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি চাষাবাদ শুরু করবে সে তার মালিকানা স্বত্ব ভোগ করবে। কিন্তু যদি কেউ অকর্ষিত ভূমি দখল করে ৩ বছর তা অনাবাদী রেখে দেয় তাহলে সে তার সার্বিক স্বত্ব হারাবে। কৃষি উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তিনি ছিলেন সদা তৎপর। ইমাম আবূ ইউসূফ র. কর্তৃক একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সিরিয়া বিজয়ের সময় জনৈক ব্যক্তি খলিফার নিকট অভিযোগ করলেন যে, মুসলিম সৈন্যরা তার জমির উপর দিয়ে মার্চ করে তার ফসল বিনষ্ট করেছে। এ কথা শুনে খলীফা তৎক্ষণাৎ তাকে ১০ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন।[৬৬]

বিজিত ভূমিতে বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং পানি পরিচালনার জন্য খাল ও সুইজ নির্মাণ করে সেচের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। একমাত্র মিসরেই এ কাজে দৈনিক এক লক্ষ বিশ হাজার লোক নিয়োজিত ছিল এবং তাদের বেতন ভাতা প্রদান করা হয়েছিল সরকারী কোষাগার থেকে। খলীফার অনুমতি ক্রমে খুজিস্তান এবং আহওয়াজ জেলায় অনেক খাল খনন করা হয়েছিল। এ সমস্ত খালের দরুন অনেক নতুন জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল।[৬৭]

ভূমিস্বত্ব পদ্ধতি

হযরত 'উমর রা. মুসলিম সাম্রাজ্যকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য যে ভূমিস্বত্ব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. ইকতা বা ব্যক্তিগত মালিকানা পদ্ধতি

'ইকতা' ইসলামী ফিক্‌হের একটি পরিভাষা। যার অর্থ হচ্ছে সরকারের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট ভূখন্ড প্রদান। ফিক্‌হবিদগণ এর বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

১. সরকার কর্তৃক কোন মালিকানাবিহীন ভূমি চাষাবাদের জন্য কাউকে প্রদান করা হলে সে যতদিন পর্যন্ত এর খারাজ বা 'উশর দিতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত মালিকের ন্যায়ই উক্ত ভূমি ব্যবহার করতে পারবে।
২. সরকার কর্তৃক কাউকে কোন ভূমি মালিকানার অধিকার ব্যতীত শুধু ভোগ দখলের জন্য প্রদান করা হলে যাকে উক্ত ভূমি প্রদান করা হয়, সে এবং তার উত্তরাধীকারগণ কেবলমাত্র উৎপন্ন ফসলাদির অধিকারী হয়। তারা যতদিন খারাজ আদায় করবে, ততদিন পর্যন্ত সরকার তাদের নিকট হতে উক্ত ভূমি ফেরত নিবে না। এ ধরণের ভূমি তারা বিক্রয় করতে পারবে না।
৩. সরকার কর্তৃক কাউকে তার জীবদ্দশা পর্যন্ত কোন ভূমি প্রদান করা হলে সে নিয়মিত খারাজ বা 'উশর দিবে এবং সেই ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যাদী ভোগ করতে থাকবে। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সেই ভূমি সরকারের অধিকারে চলে যাবে।
৪. সরকার কোন সময়সীমা নির্ধারণ না করে কাউকে কোন ভূমি প্রদান করলে, যখন ইচ্ছা তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার সরকারের থাকবে।
৫. সরকার কোন ভূখন্ড অথবা এলাকা কাউকে প্রদান না করে খারাজ বা 'উশর যা বাইতুলমালে জমা হয় তা পুরোপুরি অথবা কিছু অংশ কোন ব্যক্তির নামে তালিকাভুক্ত থাকলে ঐ ভূমি যে চাষাবাদ করে তাকে তা হতে উৎখাত করা হবে না।[৬৮]

কিতাবুল আমওয়াল-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইক্‌তা সেই সকল ভূমির জন্যই বৈধ, যা কারো মালিকানাধীন নয়; মালিকানাধীন ভূমির ইক্‌তা বৈধ নয়।[৬৯] মহানবী সা. বিভিন্ন সময়ে যোগ্য প্রার্থীকে 'ইক্‌তা' প্রদান করতেন। পরবর্তীতে ইসলামের মানদণ্ডে ব্যক্তির প্রতিভাও 'ইক্‌তা' পাওয়ার একটি যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হতো। কোন কোন সময় মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (হৃদয় জয়) বা সান্ত্বনা প্রদান এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দলে আনার জন্য এসব মঞ্জুরী প্রদান করা হতো। কিতাবুল খারাজে বলা হয়েছে, "অনাবাদী ভূমিকে আবাদ করার অথবা ভূমিহীন কৃষক বা মুহাজিরদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে কাউকে ভূমিদান করাকে 'ইক্‌তা' বলে। মহানবী সা. ইক্‌তারূপে হযরত আবূ বকর রা., হযরত 'উমর রা., হযরত আলী রা., হযরত জুবাইর রা. হযরত বেলাল ইব্‌ন হারেছ মুযানী রা., হযরত হায়্যান ইজলী রা. ও আবইয়াজ ইব্‌ন হাম্মাল মা'আরেবী রা.-কে ভূমি দান করেছিলেন।[৭০]

'ইক্‌তা' এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে সব লোক তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেসব লোকদের যাতে অসহায় অবস্থায় পড়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে না হয়, সেজন্য তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী হচ্ছে এই যে, কোন লোক ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিলে তাকে সমাজে সম্মানিত সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কোন কোন সময় একটি বিশেষ ভূখন্ড বিজিত হবার পূর্বেই মহানবী সা. 'ইক্‌তা' প্রদান করতেন। প্যালেস্টাইনে তামীমুদ্দারী রা.-র জায়গীর মঞ্জুরী এরূপ মঞ্জুরীর একটি দৃষ্টান্ত।[৭১]

খলীফা হযরত 'উমর রা. মহানবী সা.-এর এ ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছিলেন এবং তিনিও 'ইক্‌তা' মঞ্জুরী দিয়েছিলেন। উৎপাদিত দ্রব্যের 'ইক্‌তা'র প্রাথমিক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, বায়তুল লাহাম

এর সেই ভূখন্ডটি, সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত 'উমর রা.-যা তামীমদারী রা.-কে দিয়েছিলেন। কিতাবুল আমওয়ালে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত 'উমর রা. তাঁকে এই জমি প্রদান করার সময় বলেছিলেন, 'এই জমি তোমার বিক্রয়ের অধিকার থাকবে না।' এই জমির আয় বংশ পরম্পরায় তার সন্তান-সন্ততির জন্যই নির্দিষ্ট। হযরত লায়ছ ইব্ন সা'দ র. বলেন, হযরত 'উমর রা. যদিও তামীমুদ্দারী রা.-এর জন্য তা চিরস্থায়ী ইক্তার ফরমান দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তা বিক্রয়ের অনুমতি তার থাকবে না। তাই উক্ত ভূমি আজ পর্যন্ত হযরত তামীম রা.-এর বংশেরই করায়ত্তে রয়েছে।[৭২]

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ভূমি চার শ্রেণীর ইক্তার আওতায় ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছিল। যা নিম্নরূপ ঃ

ক. সম্পূর্ণ ইক্তা হিসাবে প্রদত্ত ভূমিতে প্রাপকের মালিকানা ছিল। ক্রমান্বয়ে প্রাপকের উত্তরাধিকারীরাও মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হতো। এমনকি উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রির অধিকারও লাভ করেছিল। প্রকারভেদে এসব ভূমি থেকে খারাজ এবং 'উশর-এর দু'টি বা যে কোন একটি রাজস্ব হিসাবে নেয়া হতো;

খ. ইক্তায় প্রাপক কেবল ভূমির ফসল পেত। এতে প্রাপক ভূমি বিক্রির অধিকার লাভ করেনি। এরূপ ভূমিতে উত্তরাধিকারীরা মালিক হতো কিন্তু তারা প্রাপকের চেয়ে বেশী অধিকার লাভ করতো না;

গ. কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু প্রাপকের জীবনকালের জন্যই ইক্তা প্রদান করা হতো এবং প্রাপকের মৃত্যুর পর প্রদত্ত ভূমি পুনরায় রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যার্পিত হতো;

ঘ. কোন সময়সীমা উল্লেখ না করেও ব্যক্তিকে ভূমি প্রদান করার নিয়ম ছিল এবং সে ক্ষেত্রে যে কোন মুহূর্তে তা আবার ফেরত নেয়া যেত।[৭৩]

হিমা বা সরকারী চারণভূমি

হযরত 'উমর রা.-এর সময় প্রচলিত অপর একটি প্রথা ছিল হিমা। এর অর্থ এক বা একাধিক গোত্র কর্তৃক দখলকৃত এবং যৌথ প্রয়োজনে চাষকৃত অথবা অন্যভাবে ব্যবহৃত ভূমি। পশুর খাদ্যের অন্বেষণে বেদুঈন সম্প্রদায় কোন তৃণভূমি এলাকায় গিয়ে সেখানে তাঁবু গেড়ে কিছু দিন অবস্থান করত বলে ভূমিতে কোন মালিকানা স্বত্ব লাভ করত না। তাই ব্যক্তিগতভাবে ভূমির মালিক হওয়া ছিল বেদুঈনদের নিকট অনেকটা অপরিচিত। 'যারা প্রথমে কোন ভূমিতে আসত, ঐ ভূমিতে প্রথমে আসার কারণে যে সীমিত ভোগাধিকার পেত, সম্ভবত যৌথভাবে ব্যবহৃত ভূমি, হিমা'র উৎপত্তির উৎস ছিল সেটাই। কালক্রমে এ অধিকার চূড়ান্ত রূপ লাভ করত এবং অন্য গোত্র নীতিগতভাবে ঐ ভূমিতে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকত। সাধারণত হিমা'র বৈশিষ্ট্য ছিল পশু খাদ্য এবং পানি। সচরাচর হিমার মধ্যে এক বা একাধিক ঝরণা অথবা পানির জায়গা পাওয়া যেত। এরূপ ভূমি সাধারণত অকর্ষিত পড়ে থাকত। এ থেকে বোঝা যেত যে, এ সব ভূমি যাযাবরদের ব্যবহৃত জমি।[৭৪]

'হিমা' ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর 'উশর দিতে হতো। 'উশর দিতে ব্যর্থ হলে 'হিমা' বাতিল হতো। একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য, সালাবাহ ছিল বনু মুধানের মালিকানাধীন একটি ওয়াদি। হিলাল নামে ঐ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর খেজুর গাছের 'উশর নিয়ে মহানবী সা.-এর নিকট এসে ওয়াদীটি 'হিমা' হিসাবে তাকে বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। মহানবী সা. তাকে তা দিলেন। হযরত 'উমর রা. তাঁর

খিলাফতকালে এ বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'যদি সংশিষ্ট ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাসূলের নিকট তার খেজুর বাগানের যে 'উশর দিত তোমার নিকটও তাই প্রদান করে, তাহলে সালাবাহকে তার ওয়াদি প্রদান কর। কিন্তু যদি তা না করে তাহলে সে হল একটি মৌমাছি অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তি যে এরূপ করতে পছন্দ করে।[৭৫]

রাষ্ট্রেরও নিজস্ব 'হিমা' ছিল। কোন কোন সময় সামরিক অথবা সাধারণ জনগণের প্রয়োজনে হিমা বাজেয়াপ্ত করা হতো। হযরত উমর রা. মালিককে কোনরূপ বিনিময় প্রদান না করেই মদীনা প্রদেশের একটি হিমা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।[৭৬]

হযরত 'উমর রা.-এর ভূমি-নীতি

হযরত উমর রা.-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তরেখা আরব উপদ্বীপ থেকে শুরু হয়ে একদিকে পাক-ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত এবং অন্যদিকে আফ্রিকার মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা নিযুক্ত হবার প্রায় পাঁচ মাস পর সিরিয়া জয় করা হয়। প্রবল যুদ্ধের পর সিরিয়াবাসীগণ মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। তারা একদিকে জিযিয়া এবং অন্য দিকে খারাজ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

মুসলমানগণ তাদের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেন। হযরত উমর রা. কিছু প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে বিজিত এলাকার জায়গা জমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সকলেই তাঁকে এ কাজ করা হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তারা বলেন, সিরিয়ার এই বিরাট অঞ্চল বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে এবং উত্তরাধিকার আইন বলে বংশানুক্রমিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হতে আসবে? শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত এলাকা তার মূল ভোগদখলকারীদের অধিকারে রেখে তাদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থ সর্বসাধারণের কল্যাণে বিনিয়োগ করায় অধিকৃত এলাকার উপর পরোক্ষভাবে সকল নাগরিকেরই অধিকার স্থাপিত হয়। সরকারী ব্যবস্থায় জমি-জায়গাকে সাধারণ জনমানবের কল্যাণে পরিচালনা করার জন্য এ পদ্ধতি হচ্ছে উত্তম ও আদর্শ দৃষ্টান্ত।[৭৭]

মুসলমানগণ ষষ্ঠদশ হিজরীতে ইরাকের সওয়াদ অঞ্চল অধিকার করেন। হযরত উমর রা. সওয়াদের ভূমি বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কেও সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, রাষ্ট্রের সর্বজনীন ও সামগ্রিক দায়িত্ব এবং জরুরী কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অধিকৃত ভূমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে নির্ধারণ করা অপরিহার্য। অন্যথায় বাইতুলমাল শূণ্য হয়ে যাবে: দেশ রক্ষা, অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃংখলা ও জনগণের অভাব অনটন পূরণ করার দায়িত্ব পালন প্রভৃতি সামগ্রিক কাজ চরমভাবে ব্যাহত হবে। অতঃপর তিনি তাঁর মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহতো

শাস্তিদানে কঠোর।"[৭৮] অর্থাৎ এই ভাবে যেসব ধন-সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের করায়ত্ত্ব হবে, তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য হবে। তা বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করে জায়গীরদারী বা সামন্তবাদের সৃষ্টি করা যাবে না। আর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রই তার বিলি ব্যবস্থা করবে, পারস্পরিক কৃষিনীতি অনুযায়ী লোকদের দ্বারা তা চাষাবাদ করাবে এবং উৎপন্ন ফসল হতে রাষ্ট্র তার প্রাপ্য অংশ আদায় করে নিবে। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসূফ র. বলেছেন "হযরত উমর রা. এই সমস্ত জমিকে তৎকালীন ও অনাগত মুসলমানদের জন্য রেখে দিলেন এবং একেই তিনি উত্তম নীতি বলে ঘোষণা করলেন।[৭৯]

হযরত উমর রা. ইরাক বিজয়ী হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাছ রা.-কে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, "শত্রু থেকে অধিকৃত যে সকল প্রাণী ও মালামাল হস্তগত হবে তা থেকে খুমুস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রীয় অংশ) পৃথক করে রেখে অবশিষ্টাংশ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। ভূমি, নদী-নালা কৃষকদের হাতে ছেড়ে দাও। কেননা এ থেকে যে খারাজ আদায় হবে তাদ্বারা মুসলমানদের বেতন ও ভাতা আদায় করা যাবে। আর যদি আমরা এ ভূমি সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেই তাহলে অনাগত বংশধরদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।[৮০]

হযরত উমর রা.-এর এই ভূমিনীতি সাহাবাদের পরামর্শ পর্ষদ একবাক্যে গ্রহণ ও সমর্থন করেন এবং এই নীতি অনুযায়ীই তখন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।[৮১]

হযরত উসমান ও আলী রা.-এর যুগে ভূমিব্যবস্থা

[হযরত উসমান রা.-১ মুহাররম ২৪ হি:/৭ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি: থেকে ১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হি:/১৭জুন ৬৫৬ খ্রি.পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।[৮২]

হযরত আলী রা.- ২৪ জিলহজ্জ ৩৫ হি:/২৩ জুন ৬৫৬ থেকে ১৭ রমাযান ৪০ হি:/২৫ জানুয়ারী ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত চতুর্থ খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৮৩]

হযরত 'উসমান রা.-এর খিলাফতকালে আর্মেনিয়া, আযারবাইযান, রুশীয় তুর্কিস্তান, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, রোম সাগরের কিছু সংখ্যক দ্বীপ এমন কি ঐতিহাসিক তাবারী ও গীবনের মতে স্পেনের অংশ বিশেষও মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত আলী রা.-এর খিলাফতকালেও মুসলিম রাষ্ট্রের সীমা বর্ধিত হয়। এই দুই বিশিষ্ট খলীফা মহানবী সা., হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত 'উমর রা. প্রবর্তিত ভূমিনীতিই অনুসরণ করেন।[৮৪]

তথ্যপঞ্জি

১. আল-কুর'আন, ৫:৩
২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৯
৩. আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল , *মুসনাদে আহমাদ*, রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ্-দাওলিয়া, ১৪১৯/১৯৯৮, পৃ. ১২৩৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩৪
৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নে ঈসা ইব্‌নে সাওরাহ, জামে' আত তিরমিযী, ২য় খ., মাকতাবাহ রশীদিয়াহ, তা.বি., পৃ.৯৬

৬. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১৮
৭. প্রাগুক্ত
৮. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, বাংলা অনু. আবদুস শহীদ নাসিম, আকরাম ফারুক, আবদুল মান্নান তালিব, মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: ১৯৯৭, পৃ. ১১৭
১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খ., বৈরুত : দারু সাদির, তা. বি., পৃ. ১১৩
১১. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৫৫
১২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন*, (অনু: মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ২৪
১৩. আলতাফ হোসেন, "খলীফা" *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খ.,ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৩৯৪
১৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খ., ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, পৃ. ৫১৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
১৯. প্রাগুক্ত
২০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, *জামে' আত তিরমিযী*, ২য় খ., দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়া, তা.বি., পৃ. ২০৯
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২
২৪. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬
২৫. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: আনা দারুল হিকমাহ ওয়া আলিয়্যু বাবুহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭২৩, পৃ. ২০৩৫
২৬. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: লা-ইউহিব্বু আলিয়্যান মুনাফিক ওয়ালা-ইউবগিদুহু মুমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৮১৭, পৃ. ২০৩৫
২৭. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: মানাকিবু আবদির রহমান ইবনি আওফ ..., প্রাগুক্ত, হাদীস
নং ৩৭৪৭, পৃ. ২০৩৭
২৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: ফাযায়িলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ: ফাযায়িলু আবি বাকরিস-সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৩৮৬, পৃ. ১০৯৮
২৯. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: উইকতাদু বিলাযিনা মিন বা'দি আবি বাকরিন ও উমার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৬২, পৃ. ২০২৯
৩০. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: লা-ইয়ানবাগি লি-কউমিন ফিহিম আবু বকর আইউ ওম্মহুম
গাইরুহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৭৩, পৃ. ২০৩০
৩১. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: ইন্নাল্লাহা জা'আলাল হাক্ক 'আলা লিসানি উমার ওয়া কলবাহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৮২, পৃ. ২০৩১

৩২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৩৩. ইমাম তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, প্রাগুক্ত, ৩য় খ , পৃ. ২০৩
৩৪. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খ , পৃ. ৫০
৩৫. 'হযরত আবূ বকর রা.' - এর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ, সিদ্দীক ও আতীক উপাধি, উপনাম আবূ বকর। তবে আবূ বকর নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর পিতান নাম উসমান, উপনাম কুহাফা। মাতার নাম সালামা, উপনাম উম্মুল খাইর। মহানবী সা.-এর জন্মের সোয়া দুই বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনুরূপ সময়ের ব্যবধানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই ইন্তিকালের সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল মহানবী সা.-এর সমান অর্থাৎ ৬৩ বছর। তিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলিম। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সঞ্চিত ৪০ হাজার দিরহাম দীনের কাজে উৎসর্গ করেন। হিজরতসহ ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধ ও সংকটকালে তিনি মহানবী সা.-এর সাথে ছায়ার ন্যায় থাকতেন। নবী সা.-এর সাথে নিজ কন্যা হযরত আয়েশা রা.-কে বিবাহ দিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো নিবিড় করেন। নবী সা.-এর ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ' (আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি) উপাধি লাভ করেন। খিলাফতের মসনদে আরোহণ করে কতিপয় সংকটের মুখোমুখি হন এবং তা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন। ফলে ইসলামের ইতিহাসে তিনি 'ত্রাণকর্তা' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কুরআন সংকলন তাঁর অন্যতম অবদান। তিনি ১৩ হিজরী ২১ জুমাদিউল উখরা ৬৩৪ খ্রি. আগষ্ট মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মহানবী সা.-এর পাশে সমাহিত করা হয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-ইবন সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, বৈরুত : দারু সাদির, তা.বি, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১-৪৭)।
৩৬. এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা, "আবূ বাক্র আস-সিদ্দিক", ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
৩৭. মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, তারিখে ইসলাম, (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ.৩৫।
৩৮. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর রা.-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, (অনু: জয়নুল আবেদীন মজুমদার), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ.৪-৫।
৩৯. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খ., ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৬, পৃ.২৭।
৪০. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর রা.-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ.৫।
৪১. 'মুরতাদ'- মুরতাদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে দীন ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে কুফর গ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে এবং তওবা করার জন্য বলতে হবে। তওবা করলে তাকে ক্ষমা করা যাবে, আর তওবা না করে কুফরের উপর অটল থাকলে ইসলামের দন্ডবিধির আওতায় তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল-াহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, 'মুরতাদ' ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ.২১৫-২২৭।
৪২. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, তারিখুত তাবারী, কায়রো, দারুল মা'আরিফা, তা.বি., পৃ. ৬৭
৪৩. আল্লামা শিবলী নোমানী, আল-ফারুক, (অনু: মাওলানা মুহীউদ্দীন খান), ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০২, পৃ.১৩৩।
৪৪. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

৪৫. মহানবী সা. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর তথাকার বিশৃংখল অধিবাসীদের মধ্যে একতা ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যে সামাজিক সনদ ঘোষণা করেছিলেন তাই মদীনার সনদ হিসাবে পরিচিত? (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ, বৈরুত : মাকতাবাতুস-সাফা, দারুল বায়ান আল-হাদীসাহ, ১৩৭৫/১৯৫৫, ৩য় খ., পৃ. ৩৪১)।

৪৬. 'হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা.'- হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হারবুল ফিজার আল আ'জম -এর চার বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর যিলহাজ্ব মাসে অর্থাৎ হিজরতের ৭ বছর পূর্বে ২৬/২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি যুক্তিবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ব করেন। মহানবী সা.- এর যুগের প্রাথমিক দিকে তিনি ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের নির্যাতন করতেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরক্ষণেই শত্রুদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং সেখানে বহু লোকের মারপিটের মোকাবেলা করেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী সা.-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর তিনি হযরত আবূ বকর রা.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর রা.-এর খিলাফতকালে হযরত 'উমর রা. মদীনার প্রধান বিচারক নিযুক্ত হন। হযরত আবূ বকর রা.-এর ইন্তিকালের পর তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজেন্টাইন, রোম ও পারস্য সম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬ টি শহর বিজিত হয়। অগ্নি উপাসক আবূ ল'লু ফিরোজ ফজরের নামাযে দাড়ানো অবস্থায় এই মহান খলীফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত করার তৃতীয় দিনে ২৪ হিজরী ১ মুহাররম তিনি শাহাদাত বরণ করেন। যদিও কোন কোন বর্ণনায় দু' একদিন পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন বলে উল্লেখিত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ হামীদুল-াহ/এ.বি.এম আব্দুর রব, "উমর ইবনুল খাত্তাব রা.", ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ২২-৩৬)।

হযরত উমর রা. খলীফা নির্বাচিত হবার পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ঃ "তোমাদের ধন-সম্পদে আমার অধিকার ততটুকু, যতটুকু অধিকার স্বীকৃত হয় ইয়াতীমের সম্পদে তার অভিভাবকের জন্য। আমি যদি ধনী ও স্বচ্ছল অবস্থায় থাকি, তবে আমি কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি দরিদ্র হয়ে পড়ি তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পদ গ্রহণ করব। হে মানব মন্ডলী! আমার উপর তোমাদের কতগুলো অধিকার রয়েছে, আমার পক্ষ থেকে তা আদায় করা কর্তব্য। প্রথমত ঃ দেশের রাজস্ব ও গনীমতের মাল - তা অহেতুক ব্যয় না হয়; দ্বিতীয়ত, তোমাদের জীবিকার মান উন্নয়ন ও সীমান্ত সংরক্ষণ আমার দায়িত্ব। আমার প্রতি তোমাদের এই অধিকারও রয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে কখনো বিপদে ফেলব না।" অপর এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের যে কেউ আমার মধ্যে নীতি-বিচ্যুতি দেখতে পাবে, সে যেন আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে।" উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ হতে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! আপনার মধ্যে আমরা কোন নীতি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে এই তীব্রধার তরবারি দ্বারা তা ঠিক করে দেব।" (মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১)

৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৩য় খ., পৃ.২৭২

৪৮. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, জামে আত-তিরমিযী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

৪৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

৫০. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৫২. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর ভূমি সংস্কার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃ. ২০৫

৫৩. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মাওদুদী (র.), ইসলামী মা'শিয়াত কা উসূল, বেতার ভাষণ, উদ্ধৃতি : ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর - এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ২০৫

৫৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

৫৫. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৫৬. আল্লামা শিবলী নোমানী, আল ফারুক, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৫৭. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫৮. আল-কুরআন, ৫৭:৭

৫৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৬০. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরূত, ১৯৭৮, পৃ. ১৫৮-৫৯

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-৬৩

৬২. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

৬৩. আবূ উবায়েদ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬৪. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা, ৩য় খ., কায়রো, : মাকতাবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩২৮/১৯১০, পৃ. ৫৬

৬৫. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩

৬৬. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৬৭. প্রাগুক্ত

৬৮. সাইয়্যেদ নাযীর নিয়াযী/আবদুল জলীল, "ইকতা' ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ.২৯৪।

৬৯. আবূ উবায়েদ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, কিতাবুল আমওয়াল, বাবুল ইক্‌তা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৭০. আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

৭১. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৭২. আবূ উবায়েদ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৭৩. ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৭৪. প্রাগুক্ত

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৭৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪-৫৫

৭৮. আল কুরআন, ৫৯ :৭

৭৯. ইমাম আল-আবু ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৮০. আবূ উ[illegible] কাসি ইব্‌ন সালাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬

৮১. মা[illegible] মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত,. ১৫৬

৮২. হযরত উসমান রা. ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় মহান খলীফা। তিনি হযরত আবূ বকর রা.-এর দাওয়াতে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী সা.-এর জামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। মহানবী সা.-এর জীবদ্দশায় ইসলামের কল্যাণে প্রভূত অবদান রাখেন। তিনি অনিবার্য কারণে বদর

যুদ্ধ ব্যতীত মহানবী সা.-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি যাতুর-রিকা যুদ্ধের সময় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন, "প্রত্যেক নবীরই বন্ধু আছে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে 'উসমান রা.। (ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী, অধ্যায় : আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ : রফীকী ফিল জান্নাতি উসমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৯৮, পৃ. ২০৩২)। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি মহানবী সা.-এর দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন ওহী লেখকদের অন্যতম। হযরত আবূ বকর রা.-এর সময় তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত 'উমর রা.-এর আমলে হযরত 'উসমান রা.-এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয়ে জানা যায় না।

হযরত 'উমর রা. খলীফা নির্বাচনের জন্য শাহাদাত বরণের পূর্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করে যান। বোর্ড সদস্যগণ হলেন, হযরত 'উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত যুবাইর রা., হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাছ রা. এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ রা.। তাদের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত 'উসমান রা. মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। (১ মুহাররম ২৪ হি:/ ৭ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি.)। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। (মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইসলাম) অনু : মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক), ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ.৭২)।

৮৩. হযরত আলী রা. ছিলেন ইসলামের চতুর্থ মহান খলীফা। তিনি ছিলেন আশারা মুবাশশারার অন্যতম। কিশোর বয়সে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলী রা. তাদের একজন। তিনি একদিকে মহানবী সা.-এর চাচাত ভাই এবং অপর দিকে তাঁর জামাতা। তিনি মহানবী সা.-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধ এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বের জন্য 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর বাঘ) উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ৩ জন মহান খলীফার আমলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত 'উসমান রা.-এর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর ৩ দিন পর্যন্ত খিলাফতের আসন শূণ্য থাকে। সে সময় পরবর্তী খলীফা হিসাবে জনগণের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি তাদের অনুরোধ বিনম্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের অনুরোধে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত আলী রা. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর চরম অরাজকতা ও বিদ্রোহাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হন। বিশেষত হযরত 'উসমান রা.-এর হত্যার বিচার দাবী এবং জঙ্গে জামাল ও সিফফীন যুদ্ধের ধকল সামলাতে তাঁকে ভীষণ বেগ পেতে হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি কঠোর ধৈর্যধারণ পূর্বক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। তিনি খিলাফত পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত 'উমর রা.-এর পূর্ণ অনুসরণ করেন। হযরত আলী রা. জীবনের বেশীর ভাগ সময়ে মদীনায় অতিবাহিত করলেও খিলাফতের পুরো সময় তিনি কূফায় অবস্থান করেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানভান্ডার আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়। মামলা-মুকাদ্দমার বিচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। হযরত 'উমর রা. তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমাদের মধ্যে বিচারক হিসাবে আলী রা. অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। এবং কুরআন বিশারদ হিসাবে অধিক দক্ষ হচ্ছেন 'হযরত 'উবাই ইব্‌ন কা'ব রা." (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১)।

৮৪. আবূ উবায়েদ কাসিম ইব্‌ন সালাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ৮১-৮৬

ইসলামের পানি আইন ও বিধি বিধান

মো. নূরুল আমিন

॥ বারো ॥

ইরাক ঃ ইরাকের প্রাচীন নাম মেসোপটোমিয়া। এর উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে সউদী আরব ও কুয়েত, পূর্বে ইরান এবং পশ্চিমে সিরিয়া ও জর্ডান। আরব ও পারস্য উপসাগরের দিকে এই দেশটির প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকুল রয়েছে। এই দেশটির ভৌগোলিক বিভাজনের মধ্যে রয়েছে ইউফ্রেতিস নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম এলাকা জুড়ে মরু অঞ্চল (সিরীয় মরুভূমি অংশ) তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মাঝামাঝি আল জাজিরা উচ্চ ভূমি, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং বাগদাদের উত্তরাঞ্চল থেকে শাতিল আরব পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সমভূমি অঞ্চল। মরু অঞ্চলে ওয়াদির বিস্তৃত শাখা প্রশাখা রয়েছে যা বর্ষা মওসুমে ইউফ্রেতিসে এসে পতিত হয়। এসব এলাকায় মরুদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে এবং পশু পালনের জন্য বেদুঈনরা সেখানে বসতি স্থাপন করে। আল জাজিরার পাহাড়ী এলাকায় গভীর উপত্যকায় গিয়ে পানি পড়ে এবং এসব অঞ্চলে সেচের কাজে পানি ব্যবহার খুবই কঠিন। তবে কয়েকটি উপত্যকা ছাড়া বেশীর ভাগ এলাকাই চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত এলাকায় বৃষ্টিপাত হয় এবং মাটির প্রকৃতি পাললিক সে সমস্ত এলাকায় কৃষি কাজ সম্ভব এবং তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী ও তাদের শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত পানি কৃষি কাজকে সহজতর করে তোলে। বসরায় প্রায় ৬৪ কি.মি. উজানে উপরোক্ত দু'টি নদী শাতিল আরবে এসে মিলিত হয়েছে। এই এলাকায় প্রায়শই বন্যা হয় এবং পলি পড়ে। তদুপরি জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা এখানে একটি বিরাট সমস্যা।

ইরাকের কৃষি উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে গম, বার্লি, ধান তুলা এবং খেজুর। পশু পালন ইরাকী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ইরাকের জিএনপির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

উল্লেখ্য যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে সুমেরীয়রা ইরাকে জলপ্রবাহ ভিত্তিক বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার সূচনা করে। সুমেরীয়রা মিশরের প্রাচীন রাজবংশ ফেরাউনদের সম সাময়িক ছিল। তারা মেসোপটোমিয়ায় এত শক্ত, মজবুত ও বিস্তৃত সেচ নেটওয়ার্ক তৈরী করেছিল যে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও শত্রুরা তা ধ্বংস করতে পারেনি। এর প্রায় দু'শতাব্দি পরে সুমেরীয়রা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি সেমেটিক গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে বাগদাদ কেন্দ্রিক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে, বেবিলনীয় সাম্রাজ্যের মাধ্যমে যার অভিব্যক্তি ঘটে। পরবর্তীকালে মেসোপটোমিয়া

লেখকঃ সম্পাদক, থটস অন ইকোনমিক্স, আইইআরবি এবং সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

বেবিলনীয় সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় এবং এর ষষ্ঠ শাসক হামোরাবির আমলে বহু আইন ও বিধি বিধান প্রণীত হয়। বলাবাহুল্য সম্রাট হামোরাবি শুধু একজন দেশ বিজয়ী বীরই ছিলেন না, তিনি একজন সংস্কারক ও ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ১৯৫৬ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বেবিলন শাসন করেন। তার আমলে সেচ ও গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহার সংক্রান্ত আইনও প্রণয়ন করা হয়; কাল পরিক্রমায় এই আইনগুলোই আসিরীয়, আর্কামেনীয়, সাসানীয়, গ্রীক বীর আলেকজান্ডার এবং রোমানদের হাত হয়ে সপ্তম খৃষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপের মুসলমান শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করা পর্যন্ত অবিকল অবস্থায় ছিল। হযরত আবু বকর রা. এর আমলে ইরাককে ক্ষয়িষ্ণু সাসানীয় সাম্রাজ্যের আওতা থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুসলিম শাসকরা প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করেনি বরং ইসলামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় এধরনের আচার, বিধি বিধানসমূহকে সংরক্ষণ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইরাকের রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের ইতিহাস বেশ কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এর মধ্যে ইসলামপূর্ব, ইসলাম-উত্তর আরব বিজয় ও ওসমানীয় আমল এবং বৃটিশ ম্যাণ্ডেট ও স্বাধীনতা উত্তর বর্তমান অবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে মিত্র শক্তি ইরাককে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীনে ন্যস্ত করে। মিত্র শক্তির এই সিদ্ধান্তে ইরাকে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এ প্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসকরা সেখানে একটি আরব সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সিরিয়ার হাশমী বংশীয় সিংহাসনচ্যুত যুবরাজ ও আরব মুক্তি আন্দোলনের নেতা বাদশাহ্ ফয়সালকে ১৯২১ সালের ২৩ আগস্ট ইরাকের বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ সময় থেকে ১৯৩২ সালের ৩ অক্টোবর এই দেশটিকে স্বাধীনতা প্রদান করা পর্যন্ত ইরাকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইরাকীদের হাতে ছিল না। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম শাসনামলের পানি আইন ও বিধি বিধানসমূহ ঐ সময়ে যুগোপযোগী করার নতুন কোনও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

পানির মালিকানা, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতা উত্তর ইরাকে নতুন করে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে এক্ষেত্রে পুরাতন আইনসমূহের মূল স্পিরিট সম্পূর্ণভাবে লংঘিত হয়নি। ইরাকী শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপক রদবদলও ঘটে। অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান দেশটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ১৯৬৪ সালের দিকে ইরাকের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে; তখন এই দেশটিকে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় যে, এর ভিত্তি হবে আরব ঐতিহ্য ও ইসলামী মূলমন্ত্র। এর ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে একটি অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্রও গৃহিত হয়। এই শাসনতন্ত্রে প্রাকৃতিক সম্পদকে জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে মালিকানার সাথে সামাজিক কর্তব্যকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং কৃষি সংক্রান্ত সম্পত্তির অতিরিক্ত অংশকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। পানিকে বরাবরের ন্যায় মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের মর্যাদা দেয়া হয় এবং এই সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানে ইসলামী শাসনামলের সাফল্য ও কীর্তিসমূহকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুত ১৯৭০ সালের কৃষি সংস্কার আইন অনুযায়ী ইরাকে ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এই পরিমাণ সেচযোগ্য জমির ক্ষেত্রে ৬০০ ডোনাম এবং সেচের অযোগ্য জমির ক্ষেত্রে ২০০০ ডোনাম। জমির এই সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করলে সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে অতিরিক্ত জমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসতে

পারেন এবং এইভাবে আনা জমি সরকারীভাবে ভূমিহীন দের মধ্যে বন্টন করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইরাকে ১ ডোনাম জমি ০.৯৫ হেক্টর জমির সমপরিমাণ। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মধ্যে তাপু এবং লেজমার মাধ্যমে প্রাপ্ত জমি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাপু হচ্ছে সরকারের কাছ থেকে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমি যা প্রাপক হস্তান্তর করতে পারেন। কিন্তু লেজমার মাধ্যমে প্রাপ্ত জমি হস্তান্তর যোগ্য নয়। ইরাকের আইন অনুযায়ী পানির মালিকানা সরকারের এবং তা সরকারী বেসরকারী উভয় মালিকানাধীন জমিতে ব্যবহারযোগ্য। এ প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ জলাশয় বিশেষ করে নদী নালা, খাল-বিল, জলাশয়,হ্রদ, পুকুর,দিঘী এর সবকিছুই সরকারী মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। তবে ঝর্ণা এবং কুয়া থেকে সংগৃহীত পানির মালিকানা ব্যক্তি দাবি করতে পারেন।

পানি ব্যবহার পদ্ধতি ও অধিকার ঃ সরকারী ও বেসরকারী উভয় মালিকানাধীন পানি ব্যবহার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ বিষয়। অর্থাৎ নির্ধারিত সরকারী উৎস থেকে পানি ব্যবহার করতে হলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। বেসরকারী উৎস থেকে পানি ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তর বা বিক্রি।

লাইসেন্স, পারমিট ইস্যুর পদ্ধতি ঃ মরুভূমির দেশ হিসেবে ইরাকে পানি সংকট প্রকট এবং এ প্রেক্ষিতে সরকারী মালিকানাধীন জলাশয় বা জলাধারের পানি ব্যবহারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী এজেন্সির তরফ থেকে লিখিত লাইসেন্স বা পারমিট ইস্যু করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে পানি তোলা বা সরবরাহের জন্য পাম্প, ওয়াটার হুইল অথবা অন্যকোন যন্ত্র স্থাপন বা প্রতিষ্ঠার জন্য সেচ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি পত্র গ্রহণ করতে হয়। এই লাইসেন্স হস্তান্তর কিংবা নির্ধারিত এলাকার বাইরে অন্যত্র ব্যবহার যোগ্য নয়। সেচ কর্তৃপক্ষ ইঞ্জিনের ক্ষমতা এবং পাম্পের সাইজ নির্ধারণ করে তাদের অনুমতি পত্র দিয়ে থাকেন। আবার অনুমতি পত্রে বর্ণিত শর্তাবলী লংঘন করলে অথবা জনস্বার্থ বিরোধী কোনও কাজে এই লাইসেন্স ব্যবহার করলে কর্তৃপক্ষ যে কোনও সময় তা বাতিল করে দিতে পারেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত ঝর্ণার পানি ব্যবহারের জন্য কোনও প্রকার লাইসেন্স গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। তবে সেচ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের জমিতে গিয়ে স্থাপনার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তদন্ত করে দেখতে পারেন। ১৯৬২ সালের সেচ আইন অনুযায়ী যে কোনও ধরনের পাম্প সেট বিক্রি করতে হলে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়।

অনুরূপভাবে জলাশয়ে মাছ চাষ ও মাছ ধরার জন্যও লাইসেন্স গ্রহনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মাছ ধরার নৌকার মালিকদের বছর মেয়াদী লাইসেন্স দেয়া হয়। তবে শর্ত এই যে স্থানীয় আইনে বিধান থাকলে তাদের অবশ্যই নৌ চলাচলের লাইসেন্স থাকতে হবে এবং নৌকার অবস্থা ভাল হতে হবে। প্রত্যেক লিউয়া বা প্রশাসনিক অঞ্চলের দফতরে জেলে এবং তাদের নৌকা ও মাছ ধরার বিস্তারিত বিবরণ একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা হয়। পেশাগত প্রত্যেক মৎস্যজীবীর জন্য স্বতন্ত্রভাবে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সংশ্লিষ্ট দফতর মৎস্যজীবীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সংরক্ষণ করে। পুকুর খনন অথবা মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি প্রদান তাদের দায়িত্ব।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বর্তমানে ইরাকে পানি ব্যবহারের জন্য অগ্রাধিকারমূলক কোনও বিধি-বিধান নেই।

জনহিতকর ও লাভজনক কাজে পানি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন

বাগদাদ পৌরকর্পোরেশনের অধীনে বাগদাদ পানি সরবরাহ সংস্থা নগরবাসীদের খাবার ও নিত্যব্যবহার্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে। তবে সাধারনভাবে গৃহস্থালী কাজ ছাড়া কৃষি ও শিল্প কাজে ব্যবহারের জন্য এই সংস্থা পানি সরবরাহ করে না। তবে তার তৈরী জলাধার, ট্যাংক প্রভৃতির ধারন ক্ষমতা অতিরিক্ত পানি মওজুদ থাকলে গৃহস্থালীর চাহিদাকে অক্ষুন্ন রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা শিল্প ও কৃষি চাহিদার ভিত্তিতে পানি সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনা করে থাকে। আবার গৃহস্থালী বহির্ভূত কাজে পানি সরবরাহ করলেও মওজুদের ভিত্তিতে যে কোন সময় তার পরিমান কম বেশী করার অধিকার তারা সংরক্ষণ করেন। পৌরসভা সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত বিধি বিধানের ভিত্তিতে পৌরসভা এলাকায় খাবার পানি সরবরাহের দায়িত্ব হচ্ছে বসরা পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বোর্ডের। অন্যান্য পৌর সভায় পৌর কাউন্সিলের দায়িত্ব হচ্ছে পরিশোধিত খাবার পানি ও অপরিশোধিত ব্যবহার্য পানি সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা। ব্যবহার্য পানি কৃষি ও বাগান পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয়। এ প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র আইন দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত না হলে কোনও ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানী পানি উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কোনও স্থাপনা তৈরী করতে পারে না। এক্ষেত্রে পৌর কাউন্সিল উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে পানি ক্রয় করে সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে। এই পানি সরবরাহের শর্ত ও তার দাম উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব হচ্ছে পৌর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল ফর ওয়াটার এণ্ড ইলেকট্রিসিটি প্রজেক্টস এর। এসব এলাকায় সেচ কর্তৃপক্ষ খাবার পানির স্বত্ব নির্ধারনের দায়িত্ব পালন করে। খাবার পানির উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইরাকে পরিকল্পিতভাবে নতুন নতুন স্থাপনা তৈরী হচ্ছে এবং তাদের সরবরাহ নেটওয়ার্ক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

পানির পৌর ব্যবহার

বাগদাদের আমানাহ আল আসিমা (Mayorate of Bagdad), আমিন আল আসিম (Lord mayor) এবং অন্যান্য পৌর সভা সমূহে ধুলা বালি নিবারন এবং রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ জন সমাবেশ স্থল রাখার দায়িত্ব মিউনিসি পাল কাউন্সিলের। বৃষ্টির পানি, ব্যবহৃত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতিও এই কাউন্সিলের দায়িত্ব। তবে বাগদাদ মেয়রশীপের আওতায় বাগদাদ পানি সরবরাহ সংস্থা সরকারী ও বেসরকারী খামার ও বাগানে সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ করে থাকে।

কৃষি কাজে পানির ব্যবহার

পানির প্রাপ্যতা ও জমির চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ যোগ্য পানির পরিমান নির্ধারণ ও তা সরবরাহ করা হচ্ছে সেচ কর্তৃপক্ষের কাজ। সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে, সেচ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার কারণে অথবা পানির অপব্যবহার রোধ কল্পে সেচ প্রকৌশলী যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার পানি সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন। সরকারের মালিকানাধীন পানি সেচ কাজে ব্যবহার করার জন্য সেচ কর্তৃপক্ষ বেসরকারী ব্যক্তিদের লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন। এই লাইসেন্সের শর্ত হচ্ছে এই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংস্থা যে কাজে পানির সরবরাহ গ্রহণ করেছেন সে কাজ ছাড়া অন্যকোন কাজে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী

ক্ষতিকর কোন ফসল চাষের কাজে এই পানির ব্যবহারও নিষিদ্ধ। ক্ষতিকর ফসল বলতে গাঁজা, পপি, প্রভৃতির ন্যায় ফসলকে বুঝায় যা মাদকসামগ্রীর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সরকারী মালিকানাধীন পানির উৎস হচ্ছে নদীনালা, হ্রদ, হাওড়-বাওড়, ঝরনা এবং সরকারীভাবে তৈরী স্থাপনা এবং জলাধার প্রভৃতি। ১৯৬২ সালের সেচ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি সরকারী সেচ স্থাপনার ক্ষতি হতে পারে কিংবা তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে অথবা পানির সরবরাহ ও সংগ্রহ বাধাগ্রস্থ করতে পারে এ ধরনের কোন স্থাপনা তার জমিতে তৈরী করতে পারেন না। যদি কেউ তা করেন তাহলে সরকার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াই তা ভেঙ্গে দিতে পারেন কিংবা সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তবে ইসলামী আইনের ইনসাফের দিকটি লক্ষ্য রেখে বর্ণিত সেচ আইনে প্রজা স্বার্থ রক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমনকি শর্ত লঙ্গন জনিত গুরুতর অপরাধ করলেও সংশ্লিষ্ট কৃষককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎখাত কিংবা তার সেচ সুবিধা স্থায়ী ভাবে বন্ধ করা যায় না। অবশ্য কেউ যদি তার প্রাপ্য পানির পরিমানের চেয়ে বেশী পানি সংগ্রহের লক্ষে কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করে, অন্যের জমির নালা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জমির দিকে খুলে দেয়, রাতের বেলা পানি চুরি করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ধরা পড়ে তাহলে তাকে জেল ও জরিমানা উভয় শাস্তি ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে কারাবাসের পরিমান অনূর্ধ্ব ৬ মাস। এখানে বর্গাচাষীদের স্বার্থরক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। আলোচ্য আইন অনুযায়ী বর্গাচাষের ক্ষেত্রে জমির মালিককে জমির সীমানা পর্যন্ত সেচের পানি পৌছিয়ে দিতে হয়। আর চাষীর কাজ হচ্ছে খামার সীমানার ভিতরে ঐ পানি ব্যবহার করা, আধার নির্মাণ এবং নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক তৈরী করা। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ইরাকে কৃষি পাম্প এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি অর্থমন্ত্রণালয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে নিবন্ধন করা হয় এবং হুকুম দখলকৃত জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৭০ সালের কৃষি পাম্প ও মেশিনারি আইন অনুযায়ী কৃষি সমবায় সমূহের আকার ও চাহিদার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কৃষি পাম্প ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের পাম্প মেশিন, তার আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো এবং যে জমিতে পাম্প মেশিন স্থাপন করা হয়েছে তার ৫০ শতাংশের সমপরিমান মূল্য সরকারকে পরিশোধ করতে হয়। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের মধ্যে বার্ষিক সমকিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধযোগ্য।

পানির ক্ষতিকর প্রভাব সংক্রান্ত আইন ঃ ১৯৭০ সালের ৭০ নম্বর অধ্যাদেশ অনুযায়ী যদি বন্যা জলোচ্ছাস কিংবা পাহাড়ী ঢলের কারণে দেশের কোনও অংশ বা জনগণের সম্পত্তি ও জীবন নষ্ট হবার আশংকা দেখা দেয় তাহলে সরকার ঐ বিপদ মোকাবেলা করার জন্য যে কোন সরকারী বা বেসরকারী ভবন বা স্থাপনা ধ্বংস বা ভেঙ্গে দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হন।

পানি ব্যবহার, গুণাগুণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ঃ ইরাকে পানির অপব্যবহার ও বর্জ নিয়ন্ত্রনের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৪নং রেগুলেশন অনুযায়ী পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পানির পাইপ তৈরী ও বসানোর ব্যাপারে কিছু মানগত বিধি বিধান (Specification) মেনে চলতে হয়। বাগদাদে পানি সরবরাহের কাজ শুরু থেকেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ; অপচয় ও অপব্যবহার রোধই এর প্রধান কারণ। এই জেলায় গৃহস্থালী কাজ ছাড়া, শিল্প বা অন্যকোন কাজে পানি সরবরাহ করার নিয়ম নেই। পানি উৎপাদন যদি পর্যাপ্ত হয় এবং ট্যাংক ও জলাধার সমূহ ভর্তি থাকে তা হলে সীমিত আকারে কৃষি ও শিল্পখাতে পানি সরবরাহ করা হয়। তবে উৎপাদন ও মওজুদ সংকট দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় গৃহস্থালী বহির্ভূত এই সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারেন। আবার

১৯৬২ সালের সেচ আইন অনুযায়ী সেচ কাজের জন্য প্রদত্ত পানি যদি কেউ অপব্যবহার করে অথবা সংশ্লিষ্ট কৃষকের অবহেলার জন্য পানির অপচয় হয় তা হলে দায়িত্ব প্রাপ্ত সেচ প্রকৌশলী পানির সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারেন। এ ছাড়াও সেচ পাম্প স্থাপন সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলী লঙ্ঘণ করলে তিনি এক তরফা লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতাও সংরক্ষণ করেন। বলা বাহুল্য ইরাকে প্রত্যেকটি পাম্পের জন্য একটি নির্ধারিত সরবরাহ এলাকা রয়েছে। পাম্প মালিকরা যদি পানির সংকট সৃষ্টি করে এলাকার কোনও চাষীকে পানি থেকে বঞ্চিত করে এবং সরকার নির্ধারিত হারের তুলনায় সেচ চার্জ বেশী আদায় করে তাহলে সেচ কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আবার লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট পাম্প মালিক পানি উত্তোলন ও সরবরাহের কাজে তা ব্যবহার করতে না পারেন তা হলে তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়।

স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ

১৯৬৭ সালের ২৫ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইরাকে যথেচ্ছভাবে পরিত্যক্ত ও দূষিত পানি নিষ্কাশন করে নদ নদীতে ফেলা যায় না। এ জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে বিশেষ পারমিট গ্রহণ করতে হয়। এই পারমিটে কোন নদী বা জলাশয়ে কি পরিমাণ পরিত্যক্ত ও দূষিত পানি ফেলা যাবে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। নদী-নালা ও পানি সম্পদকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই দেশের বিদ্যমান আইন অত্যন্ত সজাগ এবং পানির দূষণের মাত্রা নির্ণয় করে তা যদি সহনশীল সীমার মধ্যে থাকে তা হলেই শুধু তা জলাশয়ে ফেলার অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। শিল্প কারখানাগুলোকেই তাদের বর্জ পানির দূষণ পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট সহ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্কাশন অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭-১১২

মানিলন্ডারিং অপরাধ ও বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ঃ একটি ইসলামী বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন

'মানিলন্ডারিং' আধুনিক আর্থিক পরিভাষাসমূহের একটি। অর্থের অবৈধ উৎসকে আড়াল করে তা বৈধ করার প্রয়াসই মানিলন্ডারিং। বিভিন্ন দেশে এ প্রয়াস বিভিন্ন নামে অভিহিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'কালো টাকা সাদা করা' পরিভাষাটিই ব্যবহৃত হয়। অর্থ পরিচ্ছন্নকরণও একটি সম্পৃক্ত পরিভাষা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মানিলন্ডারিং এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বিশ্বময় এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এ অপরাধটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এটি প্রতিরোধ করার জন্য 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং অপরাধ একটি দু'ধারী তরবারী। এর কারণে একদিকে যেমন জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অন্যদিকে তেমন সম্পৃক্ত অপরাধের মাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি পায়। মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়ার সূচনাটি আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের মধ্যে সীমিত থাকলেও বর্তমান সময়ে তা নির্দিষ্ট গণ্ডি পেরিয়ে দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ অপরাধ চক্রের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে।

ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে এ পরিভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা 'হারাম উপার্জন' বা 'অবৈধ উপার্জন' আধুনিক এ পরিভাষার সম্পূরক একটি পরিভাষা। মানিলন্ডারিং এর পরিসরের চেয়ে ইসলামী ফিক্‌হ-এর হারাম উপার্জন'র পরিসর ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলাম মানবতার সার্বিক কল্যাণচিন্তার ভিত্তিতে বিধি-বিধান প্রণয়ন করে ও এ কারণে শুধু মানিলন্ডারিং নয় বরং এর সাথে সম্পৃক্ত সব অপরাধ, এর উৎসসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত করেছে। ইসলাম বিভিন্ন অপরাধ প্রতিরোধের জন্য যে সব প্রক্রিয়া গ্রহণ করে মানিলন্ডারিং এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। প্রথমত: মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে মানবতার জন্য ক্ষতিকর কার্যাবলি থেকে বিরত থাকার মানসিকতা তৈরি করেছে। অত:পর এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে সতর্ক করেছে। সর্বশেষ যারা এর সাথে জড়িত হয়ে পড়বে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অপরাধ মূলোৎপাটন করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বর্তমান সময়ের আলোচিত এ বিষয়টির ইসলামী বিশ্লেষণের পূর্বে এর পরিচিতি জানা আবশ্যক। ব্যবসায় অভিধানে মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা।

Legitimization (washing) of illegally obtained money to hide its true nature or source (typically the drug trade or terrorist activities). Money laundering is effected by passing it surreptitiously through legitimate business channels by means.[১]

মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞায় অন্যভাবে বলা হয়েছে:

Concealing or disguising how illegally obtained funds (such as from drug trafficking, gun smuggling, corruption, etc.) is generated to avoid a transaction-reporting requirement under state or federal law.[২]

ড. হামদী আব্দুল আযীম বলেন: জ্ঞাতসারে অর্থের অবৈধ উৎস, এর প্রকৃতি ও এ সংক্রান্ত লেনদেন গোপন করে তাকে বৈধ করার প্রয়াস গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে জাতীয় আয়ে অবদান রাখা।[৩]

বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা[৪]

(অ) সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence) সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তার হস্তান্তর, রূপান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা বা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বিদেশে পাচার;

(আ) কোন আর্থিক লেনদেন এমনভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা যাতে এই আইনের অধীন তা রিপোর্ট করার প্রয়োজন হবে না;

(ই) এমন কোন কাজ করা যার দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয় বা এরূপ কার্যসম্পাদনের চেষ্টা করা বা অনুরূপ কার্যসম্পাদনে স্বজ্ঞানে সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করা।

মানিলন্ডারিং-এর প্রকৃতি

বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে মানিলন্ডারিং সংঘটন হয়ে থাকে। যেমন-

প্রথমতঃ মোটা অংকের ছোট নোট বড় নোটে রূপান্তর।

দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বরাবর অন্যান্য ব্যাংক যেসব নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করে সেসব প্রতিবেদনে আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাংকে সঞ্চিত জামানত খণ্ডিতকরণ।

তৃতীয়তঃ 'সন্দেহজনক লেনদেন' যার অর্থ- (১) যা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ থেকে ভিন্ন, (২) যা সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, এর সাথে কোন অপরাধ হতে অর্জিত সম্পত্তির সংশ্লিষ্টতা আছে।[৫]

চতুর্থতঃ অজ্ঞাত উৎস থেকে কোন প্রকার তথ্য অবগত করা ছাড়াই একাউন্টে মোটা অংকের টাকা জমা করা।

পঞ্চমতঃ ব্যাংকের লকারে বড় অংকের নগদ অর্থ বা সম্পদ জমা রাখা।

ষষ্ঠতঃ দেশে বা বিদেশে অর্থ পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবসার আড়ালে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন।

সপ্তমতঃ ব্যাংক কার্ড বিশেষত: আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে মোটা অংকের টাকা উত্তোলন ও উক্ত অর্থ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা।

এছাড়াও নিত্যনতুন বিভিন্ন পদ্ধতিতেও মানিলন্ডারিং হতে পারে।

মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়াসমূহ

মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে সম্পাদিত হয়।[৬] যথা ঃ

প্রথম স্তর ঃ জমাকরণ (Placement)

এটি মানিলন্ডারিং এর প্রথম স্তর। এই স্তরে সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পদ তার উৎস গোপন করে ব্যাংকে জমা করা হয়। কিছুদিন পর ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে এই সম্পদ বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

এই স্তরে মানিলন্ডারিং এর বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। যেমন-

(১) কাঠামোগত পদ্ধতি: এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে সম্পদ সাদা করার ইচ্ছা করা হয় সে সম্পদ ছোট ছোট পরিমাণে বিভক্ত করা হয়, যাতে তাকে 'অস্বাভাবিক লেনদেন' হিসেবে গণ্য না করা হয়। এরপর ঐ সম্পদ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে বেনামে ব্যাংকে জমা করা হয়।

(২) অভ্যন্তরীণ আঁতাত ঃ এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাশকাটিয়ে ব্যক্তি সুবিধা আদায়ের জন্য কাস্টমারের মোটা অংকের অর্থ জমা করার আঁতাত করে।

(৩) অসত্য তথ্য প্রদান ঃ মানিলন্ডারিংকৃত সম্পদ বা এর উৎস অথবা মানিলন্ডারিংকারীর প্রকৃত তথ্য গোপন করে ভিন্ন তথ্য প্রদান করা।

(৪) অর্থ ব্যাংক থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা ঃ এই পদ্ধতি বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে আঁতাতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় যাতে অবৈধ সম্পদ বৈধ পরিচয়ে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।

(৫) যে দেশ থেকে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে সে দেশের মুদ্রা অন্য দেশে ভ্রমণকারী অথবা পণ্যবাহী পরিবহনের মাধ্যমে পাচার করা। অত:পর পাচারকৃত দেশ থেকে ব্যাংক টেলেক্স ট্রান্সফারের মাধ্যমে তা ফেরত নিয়ে আসা।

(৬) কালো টাকা দিয়ে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা, যেমন- গাড়ী, বাড়ী, বিমান, জাহাজ, প্লট, পর্যটন চেক, বন্ড ইত্যাদি। অত:পর উক্ত সম্পদ বিক্রি করে মূল্যকে তার বৈধ সম্পদ হিসেবে প্রদর্শন করা।

(৭) যে সব কোম্পানির লেনদেন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করা আবশ্যক নয়, সে জাতীয় কোম্পানির ছায়া হয়ে সম্পদ ব্যাংকে জমা করা।

দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রলেপ দান (Layering)

এই স্তরে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ করানোর পর বৈধ অর্থের মত বিভিন্ন ধরনের লেনদেন করার মাধ্যমে উক্ত অর্থের সাথে অপরাধের যোগসূত্র ও এর অবৈধ উৎস গোপন করা। এ ক্ষেত্রে যে সব

পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, তড়িৎ রূপান্তর, টি.টি., ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার ইত্যাদি। এছাড়াও পূর্বের স্তরে বর্ণিত স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের মাধ্যমেও ব্যাংকে সঞ্চিত কালো টাকার প্রলেপ দেয়া হয়। এক কথায় এ স্তরে কালো টাকার উৎস সম্পর্কে সরকারের নিরাপত্তা বিভাগ বা মনিটরিং কর্তৃপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার মাধ্যমে এ অর্থের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়।[৭]

তৃতীয় স্তর ঃ একীভবন (Integration)

এটি অবৈধ অর্থ সাদা করার প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে অর্থের মালিকের জাতীয় অর্থনীতিতে এই অর্থ একীভূত করা হয়। বৈধ সম্পদের মত এ সম্পদকে ব্যবহার করা শুরু করা হয় এবং দেখানো হয় যে, এ অর্থ তার ব্যাংকিং মুনাফা, বা ব্যবসায়ের লাভ এমনকি অর্থের মালিক তার অর্থের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহিতার মুখোমুখিও হয় না।

মানিলন্ডারিং এর স্তরসমূহকে নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ
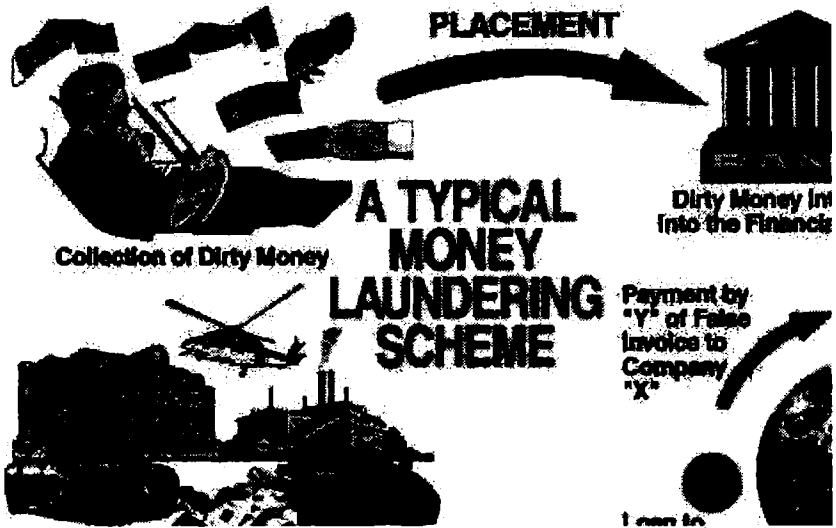
সম্পৃক্ত অপরাধ ঃ Predicate offence

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ভাষ্য মতে, "সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence) অর্থ নিম্নলিখিত এমন অপরাধ, যা সংঘটনের মাধ্যমে, অর্জিত কোন অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করার চেষ্টা করা হয়। যথা ঃ

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ;

(২) মুদ্রা জালকরণ;

(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;

(৪) চাঁদাবাজি;

(৫) প্রতারণা;

(৬) জালিয়াতি;
(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;
(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;
(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;
(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকিয়ে রাখা ও পণবন্দী করা;
(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;
(১২) নারী ও শিশু পাচার;
(১৩) চোরাকারবার এবং দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;
(১৪) চুরি, দস্যুতা বা ডাকাতি;
(১৫) আদম পাচার ও অবৈধ অভিবাসন;
(১৬) যৌতুক এবং
(১৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ।[৮]

মানিলন্ডারিং অপরাধের শাস্তি

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করলে বা তা সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করলে অন্যূন ছয় মাস এবং অনধিক সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত যে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সেই অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।[৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানিলন্ডারিং

ইসলামের দৃষ্টিতে মানিলন্ডারিং বিষয়ে আলোচনা করতে হলে শুরুতেই ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদের প্রতি ভালবাসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়।"[১০]

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে:

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা।"[১১]

সম্পদ মানুষের পরীক্ষার উপকরণ ঃ "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার সামগ্রী; আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।"[১২]

আর এ কারণে ইসলাম হালাল সম্পদ অর্জনের নির্দেশ দেয়। আর হালাল সম্পদ অর্জনের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. বৈধ কাজ। সম্পদ অর্জনের মৌলিক উপাদান এটিই।
২. উত্তরাধিকার স্বত্ব। তবে এ সম্পদ পাওয়ার জন্য মুরিছকে ইচ্ছাপূর্বক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারবে না।
৩. দান, সদকাহ, যাকাত ইত্যাদি বা এ জাতীয় সম্পদ। তবে ইসলাম এ সম্পদ গ্রহণ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

হালাল পন্থায় সম্পদের মালিকানা অর্জনের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন সীমা ইসলাম নির্ধারণ করেনি। বরং এক্ষেত্রে তিনটি শর্তারোপ করে:

১. হালাল পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা।

২. হালাল কাজে সম্পদ ব্যয় করা। মালিকানা অর্জিত হলেই যে কোন কাজে সম্পদ ব্যয় করার স্বাধীনতা ইসলাম প্রদান করে না। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও সীমা রেখা নির্ধারণ করে দেয়। যেমন- অপব্যয়, অপচয় না করা: "খাও ও পান কর এবং অপচয় করো না।"[১৩] নির্বোধ ব্যক্তির হাতে সম্পদ প্রদান নিষিদ্ধ: "যে সম্পদে আল্লাহ তোমাদেরকে অধিকার দিয়েছেন তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিও না।"[১৪] অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা। যেমন আল্লাহর বাণী:

"ইয়াতিমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। ইয়াতিমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাচ্ছে ভয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন সাক্ষি রাখ। আর আল্লাহ হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।"[১৫]

৩. অর্জিত সম্পদে আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করা ও আল্লাহর পথে ব্যয়করা। মহান আল্লাহ বলেন:

"এবং তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের নির্ধারিত হক রয়েছে।"[১৬]

'মানিলন্ডারিং'-এর শরয়ী বিধান

মানিলন্ডারিং এর উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ইসলামী জীবনদর্শন, নৈতিকতা এবং সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণেই ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে এটি একটি আর্থিক অপরাধ হিসেবে গণ্য। কেননা এ পদ্ধতিতে অবৈধ সম্পদকে বৈধ করার ঘৃণ্য প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী কোন জিনিসের মূলভিত্তি অবৈধ হলে সামগ্রিকভাবে তা অবৈধ হিসেবে বিবেচ্য। এ ক্ষেত্রে ইসলামি আইনের মূলনীতিশাস্ত্রের অন্যতম নীতি ঃ مايبنى على باطل فهو باطل "যা অন্যায়ের মাধ্যমে গড়ে উঠে সত্তাগতভাবে তা অন্যায়।"[১৭]

ভাল কাজের উদ্দেশ্যে হলেও অবৈধ পদ্ধতিতে উপার্জন ইসলাম সমর্থন করে না। الغاية تبرر الوسيلة অর্থাৎ-"ভাল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কোন পদ্ধতি

সমর্থনযোগ্য" এ নীতি ওলামায়ে কেরাম সমর্থন করেননি। এ কারণে মসজিদ নির্মাণের জন্য কেউ চুরি করলে তারও হাত কাটার বিধান রয়েছে।[১৮]

মানিলন্ডারিং-এর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মের সমষ্টি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হল ঃ

১. এটি সীমালঙ্ঘন ও পাপকাজের সহযোগিতার নামান্তর ঃ যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থেরই লন্ডারিং করা হয়, সেহেতু তাদের অর্থের বৈধতা দেয়ার অর্থ তাদের ঐসব কাজের সহযোগিতা। অথচ মহান আল্লাহ সীমালঙ্ঘন ও পাপাচারে পরস্পরকে সহযোগিতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন:

"তোমরা সৎকাজ ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপকাজ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।"[১৯]

২. শাসকের অবাধ্যতা ঃ পাপ ছাড়া অন্য কাজে শাসকের আনুগত্য আবশ্যক। বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানিলন্ডারিং নিষিদ্ধ করে আইন হয়েছে। এ আইন পালন করা সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ শাসকের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২০] এ বিষয়ে সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত হতেন।[২১]

৩. ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে মানিলন্ডারিং জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষত: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। সুতরাং এ কর্মকাণ্ড ইসলামী সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করে।

৪. মিথ্যাচারের আশ্রয় ঃ মানিলন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কেননা সে একটি কল্পিত উৎস সৃষ্টি করে তাকে তার অর্থের প্রকৃত উৎস হিসেবে চালিয়ে দেয়। অথচ ইসলামে মিথ্যাচার সম্পূর্ণ হারাম। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলে কেউ মুসলিম থাকে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল; কোন মুমিন ব্যক্তি কি মিথ্যার আশ্রয় নেয়? তিনি বললেন: না।[২২]

৫. অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষনের কৌশল।

৬. দ্রব্যমূল্য উর্ধগতির কারণ ঃ কেননা মানিলন্ডারিংকারী অবৈধ অর্থ উপার্জন করে চড়ামূল্যে পণ্য সামগ্রী কেনে। ফলে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

এভাবে মানিলন্ডারিং এর পিছনে বিভিন্ন ধরণের হারাম কার্যাবলি ও নেতিবাচক আচরণ লুকিয়ে থাকে। এ কারণে ইসলামে মানিলন্ডারিং বা অবৈধ উপার্জনকে বৈধতা দেয়ার প্রয়াসকে হারাম করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং হারাম হওয়ার প্রমাণ

উপরে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে মানিলন্ডারিং অপরাধ হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমরা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে এ অপরাধ হারাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করব।

কুরআন থেকে প্রমাণ

১. মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।"[২৩] এ আয়াতটি শরীয়াহ বর্হিভূত বা অবৈধ পন্থায় উপার্জনকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।

'অন্যায়ভাবে' বলতে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়তের দৃষ্টিতে না জায়েয।[২৪]

এ আয়াতটির বিধান মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়ার সাথে হুবহু মিলে যায়। কারণ মানিলন্ডারিংকারী ভাল করেই জানে তার ঐ সম্পদের প্রকৃত মালিক সে নয়; তথাপি সে অন্যের সম্পদ নিজের মালিকানায় নিয়ে আসার জন্য 'কালো টাকা সাদা করা' বা 'মানিলন্ডারিং' এর পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং সরকারের আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে। আইনের মারপ্যাঁচে উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিংকারীর মালিকানায় স্থানান্তরিত হলেও ইসলামী শরীআহর দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পদের বৈধ মালিক হতে পারবে না। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য:

"আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে এবং দেখা গেল তোমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বেশি বাকপটু এবং তাদের যুক্তি আলোচনা শুনে আমি তার পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখ, তোমার ভাইয়ের অধিকারর্ভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ কর, তাহলে তুমি দোযখের একটি টুকরা লাভ করলে।"[২৫]

২. মহান আল্লাহ আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে লেনদেন হয় তা বৈধ।"[২৬]

ইমাম কুরতুবী বলেন: "অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করবে না" এ আয়াতের মধ্যে জুয়া, প্রতারণা, ছিনতাই ইত্যাদি যা অর্থের মালিকের রেজামন্দি ছাড়াই গ্রহণ করা হয় এবং এমন অবৈধ অর্থ যা মালিকের রেজামন্দিতে প্রদান করা হয়, যেমন- দেহপসারিণীর বিনিময়, মদের ও শুকরের মূল্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।"[২৭]

'লেনদেন' অর্থ হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন- ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী ইত্যাদি। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং অন্যজন তার বিনিময় প্রদান করে। আর পরস্পরের সম্মতি অর্থ যাতে কোন প্রকার বৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় থাকবে না।[২৮] মানিলন্ডারিং কোন বৈধ ব্যবসা নয়। এটি আয়াতে অর্থের বৈধতার জন্য যে দুইটি শর্ত দেয়া হয়েছে 'লেনদেন' ও 'পারস্পরিক সম্মতি' তার বিরোধী।

৩. আল্লাহ আরও বলেন:

"তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্রবস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন নিকৃষ্টবস্তুসমূহ।"[২৯] আর মানিলন্ডারিং নি:সন্দেহে একটি নিকৃষ্ট উপার্জন।

৪. অবৈধ উপার্জন থেকে ব্যয় নির্বাহ ও দান-সাদকাহ করা আল্লাহ হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে

উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা তোমরা তা কখনও গ্রহণ করতে পারবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে যাও, জেনে রাখ আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।"[৩০]

হাদীস থেকে প্রমাণ

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন:

"তোমাদের জীবন, তোমাদের ধনসম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান আজকের এই দিন, এই মাস ও এই পবিত্র ভূমির মত সম্মানিত।"[৩১] হাদীসটি এ নির্দেশনা প্রদান করে যে, অন্যের ধন-সম্পদ পবিত্র অতএব তা অবৈধ পন্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটি একটি আর্থ-সামাজিক অপরাধ। মানিলন্ডারিংও এ অপরাধের অংশ বিশেষ।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

"এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ তার অর্জিত সম্পদ হালাল নাকি হারাম কোথা থেকে আসল তার পরোয়া করবে না।"[৩২] হাদীসটি আল্লাহর নবীর সা. একটি ভবিষ্যৎ বাণী। মানুষের নৈতিক পদস্খলনের নমুনা এখানে বিধৃত হয়েছে। মানুষ প্রচণ্ড অর্থলিপ্সার কারণে সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধের কোন পরোয়া করে না। মানিলন্ডারিং বা সাদা টাকা কালো করা এ অবস্থার একটি বাস্তব উদাহরণ। কেননা এর ভিত্তিতে মানুষ তার অবৈধ উপার্জনকে বৈধ করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করে।

৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

"মহান আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু কবুল করেন না।"[৩৩]

ফিকহী ধারা[1] : ফিকহের মূলনীতি[৩৪]

উপরিউক্ত কুরআন ও সুন্নাহর দলিল থেকে ইসলামী আইনের মূলনীতিশাস্ত্র বা উসূলে ফিক্‌হের কতিপয় নীতি নির্ধারিত হয়। যেমন-

১. ধারা الضرر يزال - "ক্ষতিকর বিষয় দূরীভূত করা হবে।"[৩৫]

ব্যাখ্যা: এটি ফিক্‌হের বড় মূলনীতিসমূহের একটি। যার অধীনে অনেকগুলো নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়। এ নীতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে বিষয়ের মধ্যে ক্ষতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অপসারণ আবশ্যক। কালো টাকা সাদা করাও এর পর্যায়ভুক্ত।

২. ধারা اذا سقط الأصل سقط الفرع - "কোন কিছুর মূল পতিত হয়ে গেলে তার শাখাও পতিত হয়।"[৩৬]

ব্যাখ্যা: যদি কোন কিছুর মূল বিষয় হারাম প্রতিপন্ন হয় তবে এর সংশ্লিষ্ট সবকিছুই হারাম হবে।

৩. ধারা التابع تابع - "কোন কিছুর অনুগামী তার বিধানেরও অনুগামী।"[৩৭]

ব্যাখ্যা: শাখা-প্রশাখা মূল হুকুমের অনুগামী হয়। আর এ কারণেই হারাম মালের ফসলের বিধানও তাই যা এর মূলে ছিল আর তা হল হারাম। তাছাড়া হারাম সম্পদ মূলত: হারাম কার্যাবলী তথা অপরাধের ফসল তাই বিধানের ক্ষেত্রেও তা মূলের অনুগামী। এ কারণে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ধারা

অনুযায়ী এই সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরণের লেনদেন শরীয়তে পরিত্যাজ্য হবে এবং এ থেকে উৎপন্ন কোন কিছু বৈধ হবে না।

৪. ধারা ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -"যা গ্রহণ করা হারাম তা প্রদান করাও হারাম।"[৩৮]

ব্যাখ্যা: যে সব হারাম জিনিস গ্রহণ করা বা যা থেকে উপকৃত হওয়া অবৈধ তা অন্য কাউকে প্রদান করাও অবৈধ। যেমন- সুদ, ঘুষ, গণকের পারিশ্রমিক, পতিতার বিনিময় ইত্যাদি। এসব গ্রহণ করা যেমন নিষিদ্ধ প্রদান করাও তেমন নিষিদ্ধ। কেননা এ জাতীয় নিষিদ্ধ সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা হয়। আর শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ করা যেমন নিষিদ্ধ তাতে সহযোগিতা করা ঠিক তেমনই নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন:

"তোমরা সৎকাজ ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপকাজ সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।"[৩৯]

৫. ধারা الحريم له حكم ما هو حريم له - "হারাম বেষ্টিত জিনিসের হুকুম যার কারণে তা হারাম বেষ্টিত হয়েছে তার অনুরূপ।"[৪০]

ব্যাখ্যা: যার কারণে কোন জিনিস হারাম হয় তার হুকুম এবং যা হারাম হয়েছে তার হুকুম একই। যেমন- যৌনাঙ্গের কারণে রানও সতরের আওতাভুক্ত। এজন্যই রান ও যৌনাঙ্গ উভয়ের বিধান একই। একইভাবে মসজিদের হেরেম ও মসজিদের হুকুম একই। এজন্য মসজিদের হেরেমে বেচাকেনা, নাপাকী ত্যাগ ইত্যাদি অবৈধ এবং এখানে ইতিকাফ করা বৈধ।[৪১]

এভাবে ইসলামী আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের বিভিন্ন ধারা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কালো টাকা সাদা করা বা মানিলন্ডারিং সম্পূর্ণভাবে হারাম।

বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ

শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, মানুষের সম্পদের হিফাজত এবং তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো। পক্ষান্তরে মানিলন্ডারিং এমন এক অপরাধ যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ধস নামে এবং চাতুরতার (হিলা) আশ্রয় নিয়ে শরীয়তের মূল নস (Text)-কে সম্বল করে হারাম ও অবৈধ উপার্জনকে বৈধ করার কৌশল অবলম্বন করা। এ জাতীয় কৌশল বা হিলার সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে ইমাম শাতেবী বলেন ঃ

أنها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر

"শরীয়তের কোন (নিষিদ্ধ) হুকুম বাতিল করা বা তাকে ভিন্ন হুকুমে পরিবর্তন করার জন্য কোন বাহ্যিক বৈধ কাজকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা।"[৪২]

ইসলামী আইনের মূলনীতি শাস্ত্রবিদ তথা উসূলবেত্তাগণ তাদের গ্রন্থসমূহে 'সাদ্দুয যারায়িঈ'[৪৩] নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় বিন্যস্ত করেছেন। উসূলবেত্তাগণের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মানিলন্ডারিংও সাদ্দুয যারায়িঈ-এর পর্যায়ভুক্ত। কেননা এটি এমন এক প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে হারাম সম্পদকে হালালে পরিণত করার কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং অবৈধ উৎসকে গোপন রেখে বৈধ পদ্ধতিতে ঐ

সম্পদ বিনিয়োগ ও আর্থিক বিনিময় করা হয়। সুতরাং সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকেও মানিলন্ডারিং হারাম হওয়াই যুক্তিসংগত।

মানিলন্ডারিং ইসলামী আইনের কোন অধ্যায়ভুক্ত হবে?

ফকীহগণ সম্পদ অর্জনের উৎসের দিক বিবেচনায় একে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ (১) নির্ভেজাল হালাল, (২) নির্ভেজাল হারাম ও (৩) হারাম মিশ্রিত হালাল।[৪৪]

নির্ভেজাল হালাল ঃ ঐ সম্পদ যা কোন ব্যক্তি শরীআত সম্মত কোন উৎস থেকে অর্জন করে। যেমন- বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, মীরাছ, অসীয়ত ইত্যাদি। এ জাতীয় সম্পদকে 'পবিত্র রিযক্' বলা হয়। বৈধ যে কোন পন্থায় এ সম্পদ ব্যয় করা, এ থেকে উপকৃত হওয়া বা এর রূপান্তর ঘটানোর সম্পূর্ণ অধিকার এর মালিকের রয়েছে।[৪৫]

নির্ভেজাল হারাম ঃ ঐ সম্পদ যা কোন ব্যক্তি শরীয়ত নিষিদ্ধ পন্থায় অর্জন করে। যেমন- চুরি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, ঘুষ, সুদ, পতিতার উপার্জন ইত্যাদি। হারাম সম্পদ আবার তিন প্রকার। যথা ঃ

১. সত্তাগতভাবে যা হারাম, যেমন- মদ, শুকর

২. গুণগতভাবে যা হারাম, যেমন- সুদ

৩. অর্জনের প্রেক্ষিতে যা হারাম, যেমন- অপহরণ। মানিলন্ডারিংকৃত সম্পদ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন একটি অপরাধ, অর্জনকারী ব্যক্তি পাপী বলে গণ্য এবং উক্ত সম্পদ তড়িৎগতিতে তার মূল হকদারকে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।[৪৬] ইমাম গাযালী বলেন: "যার হাতে নির্ভেজাল হারাম সম্পদ রয়েছে তার উপর হজ্জ ফরয নয়, আর্থিক কোন কাফ্ফারাও তার উপর ওয়াজিব হবে না, কেননা সে মূলত: রিক্তহস্ত। সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ প্রদানের অর্থে যাকাত শব্দটি তার ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়। বরং উক্ত সম্পদের প্রকৃত মালিককে চেনা থাকলে তার বরাবর ফেরত দেয়া এবং প্রকৃত মালিক কে তা জানা না থাকলে ফকিরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া ওয়াজিব।"[৪৭]

আল্লামা ইবন্ কাইয়্যিম বলেন: "যদি অর্জিত সম্পদ তার মালিকের অসম্মতিতে গ্রহণ করা হয় এবং তাকে কোন বদলা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় তবে ঐ সম্পদ তার মালিককে ফেরত দিতে হবে। যদি কোন কারণে ফেরত দিতে অক্ষম হয় তবে এটি তার উপর এমন ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে যা পরিশোধ করা আবশ্যক। যদি ঐ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তবে পরবর্তীতে মালিকের ওয়ারিসদের কাছে ফেরত দিবে; যদি উপরের কোনটিই করা সম্ভব না হয় তবে উক্ত সম্পদ সাদকাহ করে দিতে হবে। এ বিধান হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী, হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ ও পূর্বসূরী সকলেরই।[৪৮]

হারাম মিশ্রিত হালাল ঃ ঐ হালাল সম্পদ যার সাথে হারাম সম্পদের মিশ্রণ হয়েছে। এর দুটি ধরন হতে পারে ঃ

প্রথমত ঃ যে মিশ্রিত সম্পদে হারাম সম্পদের প্রাধান্য থাকে। যেমন- অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের সাথে এমনভাবে হালাল সম্পদের মিশ্রণ হওয়া যে উভয় সম্পদ আলাদা করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে এ সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া বা এর রূপান্তর ঘটানো বৈধ নয় এবং অতিদ্রুত তওবা

করা ও সম্পদ তার মালিককে ফেরত দেয়া কর্তব্য।[৪৯] ইবন্ রজব বলেন ঃ "যদি জানা যায় কোন সম্পদ হারাম বা হারাম পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে তবে ঐ সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা বা মুসলিম উম্মাহ'র ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে, যা ইমাম ইবন্ আব্দুল বার ও অন্যান্য ইমাম বর্ণনা করেছেন।"[৫০]

দ্বিতীয়ত: ঐ হালাল সম্পদ যার সাথে কিছু হারাম সম্পদ এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। যেমন- হালাল দশ টাকার সাথে হারাম এক টাকা মিশে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে হারাম সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে তার হকদারকে ফেরত পাঠাতে হবে এবং বাকি অর্থ হালাল হিসেবে গণ্য হবে।[৫১]

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

মানিলন্ডারিং অপরাধ দমনে ইসলাম বিভিন্নভাবে পদক্ষেপ নেয়। যেমন-

১. অবৈধ সম্পদ উপার্জন নিষিদ্ধকরণ।

২. সম্পৃক্ত অপরাধ দমন।

৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।

নিম্নে এ তিনটি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

১. অবৈধ সম্পদ উপার্জন নিষিদ্ধকরণ

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অবৈধ সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৮, সূরা আলে-ইমরানের (২৯-৩০) আয়াতের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। দীন বা ধর্মকে সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! পাপি মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে চলেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে, এগুলো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন জমা করে রাখার আস্বাদ গ্রহণ কর।"[৫২]

মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা অবৈধ আর্থিক লেনদেন করত। আল্লাহর বাণী:

"এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। এবং এ কারণে যে, তারা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করত। বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"[৫৩]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব এবং অবৈধ উপার্জনের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। আর এভাবেই ইসলাম হারাম বা নিষিদ্ধ উপার্জন থেকে মানবতাকে দূরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

২. সম্পৃক্ত অপরাধ দমন

মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ দমনে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমেও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। নিম্নে মানিলন্ডারিং সম্পৃক্ত অপরাধ দমনে ইসলামের নীতিমালা বর্ণনা করা হল:

ক. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

(১) যে নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারী, (৩) পানকারী (ব্যবহারকারী), (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানিকারক, (৬) যার জন্য আমদানি করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী ও (১০) লভ্যাংশ ভোগকারী।[৫৪] তিনি আরও বলেন: "নেশা সৃষ্টিকারী যে কোন দ্রব্যই মদ। আর যাবতীয় মদই হারাম।"[৫৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন: "যা মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তা কম হোক আর বেশি হোক হারাম।"[৫৬]

ইসলাম সব ধরণের মাদক ক্রয়-বিক্রয় ও এর ব্যবসা সম্পূর্ণ হারাম করেছে। এমনকি অমুসলিমদের জন্য হলেও। হাদীসে এসেছে: "যা পান করা হারাম করা হয়েছে তার মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম করা হয়েছে।"[৫৭]

বিশিষ্ট সাহাবী আবু তালহা রা. বলেন: "হে আল্লাহর রসূল সা.! আমি আমার অধীনে থাকা কিছু ইয়াতীমের (ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহের) জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওগুলো ঢেলে দাও এবং তার পাত্রটি ভেঙে ফেলো।"[৫৮]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বাজারে যেয়ে মদের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন।[৫৯]

খ. দেহ ব্যবসা ঃ এর কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন-

১. শরীয়ত নিষিদ্ধ পন্থায় দেহদানের মাধ্যমে উপার্জন। অন্য কথায় বলা যায়, পতিতালয়ে বা অন্য কোথাও সংঘটিত ব্যভিচারের বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থই পতিতার উপার্জন নামে অভিহিত। ইসলামি শরীয়তে যা 'মহর আল-বাগী' নামে পরিচিত। ব্যভিচারের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবসাও এর পর্যায়ভুক্ত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় উপার্জন ও গণককে প্রদত্ত বখশিশ হারাম ঘোষণা করেছেন।[৬০]

২. শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ বা রক্ত বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন।

৩. অশ্লীল শরীর প্রদর্শন বা মডেলিং, নৃত্য ও যৌন শিল্পকর্ম এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ গান-বাজনা।[৬১]

গ. চুরি ও চোরাই ব্যবসা ঃ ইসলাম চুরিকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে এবং কুরআনে এর শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিই যথেষ্ট:

"পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।"[৬২]

ঘ. রাহাজানি ঃ ইসলামে যা 'হারাবাহ' বা সংঘাত সৃষ্টি করা নামে পরিচিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের কার্যক্রমকে এই পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। এ অপরাধের বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পাসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[৬৩]

ঙ. আত্মসাৎ ঃ ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় গুলুল। বন্টিত হওয়ার পূর্বে সামষ্টিক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমত থেকে চুরি করাকে গুলুল বলা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পদাধিকার বা ক্ষমতার দাপটে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় জনগণের বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ-দখল বা আত্মসাৎ করাকে এ পর্যায়ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

" কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খেয়ানত করবেন, যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন খেয়ানতের মাল নিয়ে উপস্থিত হবে। অত:পর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণভাবে দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।"[৬৪]

চ. সুদ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ সম্পদের অন্যতম উৎস সুদ। সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান স্পষ্ট। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত ও বিবেক বুদ্ধির অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। অত:পর যার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার জন্য, আর তার ব্যাপার আল্লাহর উপর। আর যারা পুনরায় সুদ নেয় তারা দোযখের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"[৬৫]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ দাতা, গ্রহীতা, লেখক, সাক্ষী সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।[৬৬]

ছ. ছিনতাই ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিনতাই, লুণ্ঠন, অপহরণ ইত্যাদিকে ঈমান হরণকারী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ভাষায়:

"কোন লুণ্ঠনকারী মুমিন থাকা অবস্থায় মানুষের অগোচরে থাকা বিশাল সম্পদ লুণ্ঠন করে না।"[৬৭] হাদীসে বর্ণিত শব্দের অর্থ এমন মোটা অংকের মাল ছিনতাই করা যা দেখলে মানুষের চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়।

জ. মজুতদারী ঃ মজুতদারী বা সমসাময়িক পরিভাষায় কালোবাজারী সম্পদ অর্জনের এমন এক পেশা যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে এ অপরাধের নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেমন- "গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।"[৬৮] "অপরাধী ছাড়া কেউ গুদামজাত করে না।"[৬৯]

ঝ. ঘুষ ঃ যে সব সম্পদের মানিলন্ডারিং করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত টাকা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর লা'নত করেছেন।[৭০] ঘুষকে ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন: "তারা হারাম খায়।"[৭১] হযরত আলী রা., ইব্রাহীম নাখয়ী, হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যাহহাক প্রমুখের মতে এ আয়াতে 'সুহত' অর্থ ঘুষ।[৭২]

ঞ. জুয়া-লটারী-বাজি-পণ ঃ ইসলামী শরীয়তে জুয়া সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহর বাণী:
"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান মদ জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না।"[৭৩]
লটারীও এক ধরনের জুয়া। মানবকল্যাণের নামে এটি ব্যবহৃত হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তা বৈধ হতে পারে না। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে: ভাল কাজের উদ্দেশ্যে হলেও অবৈধ পদ্ধতিতে উপার্জন ইসলাম সমর্থন করে না। অর্থাৎ- "ভাল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কোন পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য" এ নীতি ওলামায়ে কেরাম সমর্থন করেননি। এ কারণে মসজিদ নির্মাণের জন্য কেউ চুরি করলে তার ক্ষেত্রেও হাত কাটার বিধান প্রয়োগ করতে হয়।[৭৪]
ট. কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ ঃ কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ (লুকতাহ্) গ্রহণ করে তার মালিক হওয়ার বৈধতা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে এ সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের, নিজের মালিকানায় এনে ব্যবহার করা হারাম।[৭৫]
ঠ. শুকর, কুকুর, মূর্তির ব্যবসা ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শুকর, কুকুর, মৃতপ্রাণী এবং মূর্তির ব্যবসাও অবৈধ উপার্জন। ফকীহগণ এসবের ব্যবসা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী
"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতপ্রাণী, শুকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন।"[৭৬] একইভাবে প্রাণীর অবয়বে ভাস্কর্য, প্রতিমা, ক্রুশ ইত্যাদি তৈরিও এর অন্তর্ভুক্ত।[৭৭]
ড. ব্যবসায়িক প্রতারণা ঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মুনাফা অর্জন করলে সে মুনাফাও ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ হবে। এ প্রতারণার ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন- ওজনে কম দেয়া, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ, দালালী, মুনাফাখোরী, খাদ্যশস্য বাজারে পৌছার পূর্বে আধপথ থেকে কিনে নেয়া ইত্যাদি। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান।
ঢ. জালিয়াতি ঃ কোন কিছু জালিয়াতি করে অর্থ উপার্জন করলে, যেমন- জাল নোট তৈরি, দলিল-দস্তাবেদ জালকরণ, চেক জালকরণ ইত্যাদি। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্ণিত আছে, মাআনা ইব্ন যিআদ বায়তুল মালের সীলমোহর জাল করে সম্পদ গ্রহণ করে। হযরত উমর রা. তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করেন অত:পর তাকে বন্দী করেন, অত:পর তাকে পুনরায় ১০০ বেত্রাঘাত করেন, অত:পর তৃতীয়বার প্রহার করেন এরপর তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত (নির্বাসন) করেন।[৭৮]
ণ. অধীনস্তদের থেকে উপঢৌকন গ্রহণ ঃ অনেক সময় সরকারী কর্মকর্তাগণ ঘুষের বিকল্প হিসেবে অধীনস্তদের থেকে উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করেন। ইসলাম এ জাতীয় উপার্জন না করার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছে। আবু হুমায়দ সাঈদী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আযদ গোত্রের ইব্ন লুতবিয়া নামের এক ব্যক্তিকে যাকাত উত্তোলনের কাজে নিয়োগ দিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের (রাষ্ট্রের) আর এগুলো

আমাকে হাদীয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন:
"আমি একজনকে কর্মকতা হিসেবে প্রেরণ করেছি অত:পর সে (ফিরে এসে) বলে, এটি আপনাদের এবং এটি আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। সে তার পিতার ঘরে বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখুক না কেউ তাকে উপহার দেয় কি না? ঐ সত্তার শপথ যার হাতে (আমি) মুহাম্মদের প্রাণ! যদি তোমাদের কেউ এ সম্পদ থেকে কিছু নেয় তবে সে তা কিয়ামতের দিন কাঁধে বহন করে উঠবে। যদি ঐ সম্পদটি উট হয় তবে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকবে। যদি গাভী হয় তবে হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। আর ছাগল হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে।"[৭৯]

৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান

মানিলন্ডারিং অপরাধ দমনের তৃতীয় ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে ইসলাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শাস্তি প্রদানের বিধান আরোপ করেছে।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মানিলন্ডারিং অপরাধের শাস্তি

মানিলন্ডারিং অপরাধ কি মূল অপরাধ নাকি সম্পৃক্ত অপরাধ? এ নিয়ে মতভেদের কারণে মানিলন্ডারিং অপরাধের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। যেহেতু এ অপরাধটি আধুনিক বিষয় সেহেতু ফিক্হের কিতাবে সরাসরি এর বিধান পাওয়া যায় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন সম্পদ বৈধ বা অবৈধ হওয়া উক্ত সম্পদের উৎসের উপর নির্ভর করে। এ কারণে শরীয়তে সুদ একটি আর্থিক অপরাধ, ঘুষ একটি আর্থিক অপরাধ একইভাবে জুয়া একটি আর্থিক অপরাধ। মানিলন্ডারিং একটি যৌগিক অপরাধ অর্থাৎ অন্য অপরাধ থেকে সৃষ্ট। এজন্য এ অপরাধের ক্ষেত্রে দুই ধরনের বিধান জড়িত। প্রথমত: মানিলন্ডারিং অপরাধের শাস্তি ও দ্বিতীয়ত: সম্পৃক্ত অপরাধের শাস্তি। এর অর্থ এই নয় যে, মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই অপরাধীকে দুই ধরনের শাস্তিরই মুখোমুখী হতে হবে। বরং সম্পৃক্ত অপরাধে জড়িত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলেই তবে তাকে উক্ত অপরাধের শাস্তি পেতে হবে।

স্থান, কাল, পাত্র, পদ্ধতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং অপরাধের শাস্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এ অপরাধ 'তা'যির'[৮০] পর্যায়ভুক্ত। আর তা'যিরের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম প্রশাসকের উপর নির্ভরশীল। সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় তিনি এর পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। বিশেষত: এক্ষেত্রে যেসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য হয় তার মধ্যে রয়েছে- অপরাধের ধরন, মাত্রা, অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের সময়কাল, স্থান, সাক্ষী, সাক্ষীর গুণাবলি ইত্যাদি।[৮১]
ইব্‌ন আবিদীন বলেন: ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে তা'যিরের পরিমাণেও পার্থক্য হয়। এটি বিচারকের ব্যক্তিগত ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে। তিনি অবস্থার আলোকে অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করবেন।[৮২]

তা'যির হিসেবে যেসব শাস্তি দেয়া যায়

তা'যির হিসেবে বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দেয়া যায়। প্রশাসক সার্বিক অবস্থা বুঝে যে কোন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন। এ সব শাস্তি দৈহিক, ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিতকরণ, আর্থিক বা অন্যান্য ধরণের হয়ে থাকে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হল:

ক) মৃত্যুদণ্ড ঃ সাধারণভাবে তা'যির হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার বিধান নেই। কিন্তু ফকীহগণ কোন কোন অপরাধের তা'যির হিসেবে বিশেষ শর্তের আলোকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান বৈধ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন: যদি অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড প্রদান ছাড়া তার অপরাধ বন্ধ না হয় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।[৮৩] কোন অপরাধী একই অপরাধ বারবার করলে ইমাম আবু হানীফার মতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।[৮৪]

খ) বেত্রাঘাত ঃ ইসলামী শরীয়তে তা'যির হিসেবে বেত্রাঘাত একটি স্বীকৃত মাধ্যম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদীন এ পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করেছেন। তাঁদের পরে আজ পর্যন্ত কেউ এ পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেনি।[৮৫]

গ) কারাদণ্ড ঃ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কারাদণ্ডের বৈধতা স্বীকৃত। কুরআনের সূরা নিসার ১৫, মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরে হযরত উমর, উসমান, আলী রা.ও খলীফা হিসেবে এ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন।[৮৬] ইমাম কারাফী যে আটটি অবস্থায় কারাদণ্ড দেয়াকে বৈধ বলেছেন অবৈধ উপার্জন তার মধ্যে একটি।[৮৭]

ঘ) নির্বাসন ঃ তা'যির হিসেবে নির্বাসন বৈধ হওয়ার বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ রয়েছে। সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখান্নিস (যে সব পুরুষ নারীদের ভাব ধরে/ তাদের পোশাক পরিধান করে) তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেন।[৮৮] উমর রা. নাসর বিন হাজ্জাজকে বসরায়, উসমান রা. তাকে সেখান থেকে মিসরে, অত:পর আলী রা. তাকে পুনরায় বসরায় নির্বাসন দেন। কোন সাহাবা তাদের এ মতের বিরোধিতা করেননি বিধায় এটি ইজমায় পরিণত হয়েছে।[৮৯]

ঙ) আর্থিক দণ্ড ঃ ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে আর্থিকদণ্ডের মাধ্যমে তা'যির বৈধ নয়। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে এর মধ্যে কল্যাণ থাকলে আর্থিকদণ্ড বৈধ।[৯০] শাফিয়ী মাযহাবের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বৈধ নয়, পুরাতন নীতিতে বৈধ। মালিকী মাযহাব অনুযায়ী তা'যির হিসেবে আর্থিকদণ্ড বৈধ এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী নিষিদ্ধ। আর্থিকদণ্ডের বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন- ১) সম্পদ অবরুদ্ধকরণ (Freezing), ২) ধ্বংসকরণ, ৩) রূপান্তর, ৪) মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি।[৯১]

চ) নোটিশ প্রদান ঃ কাযী অপরাধীকে বলবেন যে, আমি এ মর্মে অবহিত হয়েছি যে, তুমি এই কাজ করেছ। অথবা তিনি তার সেক্রেটারীকে এই কথা বলার জন্য তার কাছে প্রেরণ করবেন। এ ব্যাপারে কেউ কেউ শর্ত দিয়েছেন যে, এ ক্ষেত্রে (নোটিশের ভাষায় ও বলার ভঙ্গিতে) কঠোরতার আশ্রয় নিতে হবে।[৯২]

ছ) এজলাসে হাজিরকরণ ঃ এটিও নোটিশের মাধ্যমে হবে। তবে উপরেরটির সাথে এর পার্থক্য এটাই যে, এ ক্ষেত্রে অপরাধী আদালতের এজলাসে হাজিরা দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু উপরেরটিতে বাধ্য হবে না।[৯৩]

জ) ভর্ৎসনা ঃ ফকীহগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ভর্ৎসনার মাধ্যমে তা'যির প্রদান বৈধ। আবু যর রা. বর্ণনা করেন তিনি একজনকে গালি প্রদান করেন এবং তার মায়ের প্রসংগ তুলে তিরষ্কার করেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে আবু যর! তুমি তার মাকে ধরে গালি দিয়েছ, নিশ্চয় তুমি এমন একজন মানুষ যার মধ্যে এখনও জাহিলিয়্যাত বিদ্যমান।"[৯৪]

ঝ) বয়কট ঃ অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট করা এবং তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন, যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা। অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাকে বিছানা পরিত্যাগ করার বিধান প্রদান করেছেন।[৯৫] তিনজন সাহাবী যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও ইঙ্গিত রয়েছে।[৯৬] ইসলামে অবৈধ অর্থ বৈধ করার প্রচেষ্টা বা মানিলন্ডারিং এর শাস্তি কী হতে পারে তা ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণিত নিম্নোক্ত দীর্ঘ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. বর্ণনা করেন:

"আমরা একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে আমর ইব্ন মাররাহ আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমার হতভাগা হওয়াটাই লিপিবদ্ধ করেছেন। হাতের তালুতে দফ বাজানো ছাড়া আমার জীবিকার্জনের অন্য কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং আমাকে শালীন গান গেয়ে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিন। উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, হে আল্লাহর দুশমন! তোমার জন্য অনুমতি, সম্মান ও নিয়ামত কোনটিই নেই, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র হালাল রিযেকের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু তুমি তোমার জন্য আল্লাহ যা হালাল করেছেন তার পরিবর্তে তোমার জন্য যা হারাম সে পথ বেছে নিয়েছ। তুমি যদি পুনরায় আমার কাছে (একই আবেদন নিয়ে) আস তবে আমি তোমাকে কঠিন প্রহার করব, তোমার মাথার চুল নেড়া করে দেব, তোমাকে তোমার পরিজন থেকে নির্বাসন দেব এবং তোমার সম্পদ মদীনার যুবকদের জন্য লুট করে নেয়ার বৈধতা দান করব। এরপর আমর লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়াল। তার তখনকার অবস্থা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সে চলে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এরা হচ্ছে নাফরমান! এদের কেউ তওবা ছাড়া মারা গেলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে নপুংস ও উলঙ্গ অবস্থায় হাশর করাবেন যেমনটি তারা দুনিয়ায় ছিল। তারা তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য কাপড়ের আচল পর্যন্ত পাবে না। তারা যখনই উঠে দাঁড়াবে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।"[৯৭] এ হাদীস থেকে মানিলন্ডারিং এর যে শাস্তি প্রমাণিত হয় তা হল-

১. শারীরিক শাস্তি
২. অপরাধী হিসেবে জনসমাজে প্রচার
৩. নির্বাসন (কারাগু)
৪. সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ।

দুই ধরনের শাস্তি একত্রিতকরণ

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মানিলন্ডারিং একটি যৌগিক অপরাধ, যা সম্পৃক্ত অপরাধ থেকে জন্ম নেয়। অতএব মানিলন্ডারিং অপরাধ ও সম্পৃক্ত অপরাধের শাস্তি একত্রিতকরণ বৈধ কি না এ বিষয়ে অবগত হতে হলে আমাদেরকে ইসলামী বিধানে দুই অপরাধের শাস্তি একত্রিতকরণের বিষয়ে ফকীহগণের মতামত সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ বিষয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফকীহগণের মতে তা'যির হদ্দ বা কিসাস বা কাফ্ফারার সাথে একত্রিত হতে পারে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ব্যভিচারীর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের পর তাকে নির্বাসন দেয়া বৈধ। একইভাবে মদ্যপায়ীর শাস্তি প্রয়োগের পর তিরষ্কারের মাধ্যমে তাকে তা'যির প্রদান করা যায়। যেমন আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মদ্যপকে প্রহারের পর তাকে ভর্ৎসনা করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৯৮] মালিকীগণ বলেন, ইচ্ছাপূর্বক শত্রুতার কিসাসের সাথে তা'যিরকে একিভূত করা বৈধ। শাফিয়ীগণও কিসাসের সাথে তা'যিরকে একিভূতকরণ বৈধ বলেছেন। তাদের অন্য মত অনুযায়ী হদ্দের সাথেও তা'যির একত্রিত করা যায়। যেমন- চুরির দায়ে হাত কাটার পর উক্ত কর্তিত হাতটি গলায় ঝুলানো। ইমাম আহমদও এমনটি বলেছেন। ফাদালাহ ইব্‌ন উবাইদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক চোরের হাত কাটার পর তা (কর্তিত হাত) গলায় ঝুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৯৯] অতএব প্রমাণিত হয় যে, এক অপরাধে দু'ধরনের শাস্তি প্রদান ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য।

মানিলন্ডারিং এর অর্থ কী করা হবে?

মানিলন্ডারিং এর অর্থ ইসলামী ফিক্‌হে 'অবৈধ সম্পদ' হিসেবে গণ্য। এ সম্পদ কী করা হবে সে সম্পর্কে বর্তমান সময়ের দুজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদের মতামত নীচে তুলে ধরা হল:

ড. ইউসুফ কারযাভী বলেনঃ যে কোন অবৈধ সম্পদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়[১০০]:

১. এই সম্পদ নিজে ভোগ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অবৈধ।
২. ইসলামের শত্রুদের জন্য প্রদান করা। এটিও ইসলামে অবৈধ।
৩. সম্পদ নষ্ট করে বা জ্বালিয়ে দিয়ে অবৈধ সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়া। ইসলাম সম্পদ ধ্বংস করা নিষেধ করেছে।
৪. এই সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করে। অর্থাৎ ফকীর-মিসকীন, অনাথ-ইয়াতিম, নিঃস্ব পথিক, সামাজিক দাতব্য সংস্থার জন্য ব্যয় করা। এ পদ্ধতিটিই গ্রহণযোগ্য।

তবে অবৈধ সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করলে তা সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা "মহান আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু কবুল করেন না।"[১০১] আর এক্ষেত্রে অবৈধ সম্পদ ব্যয়ের অন্য কোন খাত না থাকায় তার একমাত্র ব্যয়ের খাতে ব্যয় করা হচ্ছে সাদাকাহ হিসেবে নয়। তবে এতটুকু যে, ঐ ব্যক্তি উক্ত সম্পদ ভাল কাজে ব্যয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। অতএব বলা যায়, এটি সম্পদের মূল মালিকের পক্ষে সম্পদ সংগ্রহকারী প্রদত্ত সাদাকাহ।

ড. কারযাভী এ প্রসংগে আরো উল্লেখ করেন: যে ব্যক্তি তওবা ও ইস্তিগফার করে অবৈধ সম্পদ থেকে নিজেকে মুক্ত করল সে সাদাকার সওয়াব পাবে না ঠিকই কিন্তু অন্য দুটি দিক থেকে সওয়াব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে:

ক) সে অবৈধ সম্পদ থেকে নিজেকে পবিত্র করার এবং নিজে তা ভোগ করা থেকে বিরত হওয়ার কারণে।

খ) সে ঐ সম্পদ ভাল কাজের ব্যবহারের মাধ্যম হওয়ার কারণে।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল হালীম ওমর বলেন:

অবৈধ সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

ক) যে সম্পদ মৌলিকভাবেই অবৈধ, যেমন মাদকদ্রব্য বা হারাম কোন উৎপাদন থেকে উপার্জিত। এ সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ছাড়াই ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে।

খ) বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে যে সম্পদ অবৈধ এবং তা মালিক থেকে জোরপূর্বক বা তার অজান্তে নেয়া হয়েছে। যেমন- চুরি, প্রতারণা, ছিনতাই ইত্যাদি। এ সম্পদ মালিক বরাবর ফেরত দিতে হবে। সম্ভব না হলে ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে।

গ) বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে যে সম্পদ অবৈধ এবং তা মালিকের সম্মতিতে অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছে, যেমন- ঘুষ। এ সম্পদ মালিক বরাবর ফেরত দিতে হবে অথবা ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে।[১০২]

অতএব বলা যায়, হারাম সম্পদ হিসেবে মানিলন্ডারিং এর অর্থ কোন ক্রমেই বৈধ হতে পারে না বিধায় এ সম্পদ রাষ্ট্র করায়ত্ত করবে। তবে মানিলন্ডারিংকারী এর বিনিময়ে কোন প্রকার নেকী বা পুরস্কার আশা করতে পারেন না। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

"যে ব্যক্তি হারাম মাল সংগ্রহ করে এবং তা দিয়ে সাদকাহ করে তবে তার কোন সওয়াব হবে না এবং এর গুরুভার তার উপরেই।"[১০৩]

তিনি আরো বলেন:

"কোন ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করে সাদাকাহ করলে তা কবুল করা হবে না। এভাবে যদি সে এই মাল থেকে নিজের জন্য ব্যয় করে তবে তাতে বরকত হবে না, যদি সে সেই মাল মীরাস হিসেবে রেখে যায় তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছে দেবে। আল্লাহ খারাপকে খারাপের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। কিন্তু তিনি খারাপকে সৎকর্মের মাধ্যমে মুছে দেন। কোন নাপাক অপর নাপাককে মুছে দিতে পারে না।"[১০৪]

কালো টাকা সাদা হওয়ার বৈধ কারণসমূহ

ফকীহগণের মতানুযায়ী নিম্নোক্ত কারণে অবৈধ অর্থের মালিকানা বৈধতায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ- ইসলামের দৃষ্টিতে কালো টাকা সাদা হওয়ার বৈধ কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. অজ্ঞতা ঃ পাপ ও শাস্তি মওকুফের জন্য অজ্ঞতা একটি সঙ্গত কারণ হিসেবে বিবেচিত। সব ধরণের অজ্ঞতার ক্ষেত্রে এ বিধান নয়। উসূলে ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞগণের মতে অজ্ঞতা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার অজ্ঞতা শরীয়ত প্রণেতা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। আর তাহল স্বাভাবিকজ্ঞানে যা থেকে সতর্ক থাকা সম্ভব হয় না। যেমন- যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের কাতারে থাকায় কাফির মনে করে কোন মুসলমানকে হত্যা করা। প্রকৃত ঘটনা জানা না থাকায় অজ্ঞতার কারণে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি কোন কাযী বিচার-ফয়সালা করেন তবে তিনি গোনাহগার হবেন না। দ্বিতীয় প্রকার অজ্ঞতা যা শরীয়ত প্রণেতা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি। যদি কেউ এটি করে তবে সে গোনাহগার হবে। আর তাহল স্বাভাবিকজ্ঞানে যা থেকে সতর্ক থাকা সম্ভব হয়।[১০৫]

২. ইসলাম গ্রহণ ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ কালে তার সাথে যে মাল-সম্পদ থাকে তা হালাল হিসেবে গণ্য হবে। যদিও তা অবৈধ পন্থায় উপার্জিত হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী উরওয়াহ ইব্‌ন মাসউদ আস্‌সাকাফী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুগীরা ইব্‌ন শু'বা জাহেলী যুগে এক গোত্রের সাথে বসবাস করতেন, তিনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করেন, অত:পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

"তার ইসলামকে আমি অনুমোদন করছি আর তার সম্পদের ব্যাপারে আমি কোন কিছু করব না।"[১০৬]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি যা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তা তারই বিবেচিত হবে।"[১০৭]

ইমাম শাফিয়ী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন: "এর অর্থ- যদি কেউ এমন সম্পদ সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে যার মালিকানা তার বলে বৈধ তবে তা তার হিসেবেই গণ্য হবে।"[১০৮]

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগীরার সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয় ঐ সম্পদে মুগীরার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে জিম্মীদের ব্যাপারে তাঁর ঘোষণা ছিল: "তাদের ধন-সম্পদ, ইবাদতখানা, সম্পত্তি, গবাদি পশু তাদেরই থাকবে শুধুমাত্র তাদের কর্তব্য হবে নির্ধারিত কর প্রদান করা।"[১০৯]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অসংখ্য মুশরিক, কাফির ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের কারো সম্পদ অর্জনের উৎস বা অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হত না যে তা বৈধ নাকি অবৈধ বরং তাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রীগণের বৈধতার অনুমোদন প্রদান করা হত।[১১০]

৩. ইস্তিহালাহ (অবৈধকে বৈধতায় রূপান্তর) ঃ

সম্পদ হারাম হওয়ার কারণ যখন দূরীভূত হয়ে যায় তখন হারামের বিধানও দূর হয়ে যায়। যেমন যদি ছিনতাই বা চুরি হওয়া সম্পদের মূল মালিক ঐ সম্পদ ছিনতাইকারী বা চোরকে দান করে তবে তার জন্য তা বৈধ হবে।

৪. শরয়ী কারণে ঃ

শরয়ী নির্দেশে কোন সম্পদ গ্রহণ করলে তার নিষিদ্ধতা প্রত্যাহৃত হয়। যেমন- যে সব কাফিরদের সাথে মুসলমানদের কোন সন্ধি বা শান্তিচুক্তি নেই তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত মাল। জিম্মীদের থেকে গৃহীত কর, তাদের সে সম্পদে সুদ, মদ, শুকরের ব্যবসা ইত্যাদি হারাম সম্পদ থেকে প্রাপ্ত

হলেও। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত বিলাল রা. উমর রা.-কে বললেন, তোমার কর্মচারীরা খারাজ গ্রহণকালে মদ ও শুকরের উপার্জন থেকে গ্রহণ করে। তখন তিনি বললেন:
"তাদের থেকে সরাসরি ঐগুলো গ্রহণ করো না, কিন্তু যদি তারা তা বিক্রি করে তবে তার মূল্য তোমরা গ্রহণ কর।'[১১] কেননা জিম্মীদের জন্য মদ ও শুকর সম্পদ কিন্তু এগুলো মুসলমানদের জন্য সম্পদ হতে পারে না।

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, মানিলন্ডারিং-এর বিষয়ে ইসলাম প্রদত্ত নির্দেশনা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী। মানিলন্ডারিং-এর পরিসর, সম্পৃক্ত অপরাধ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান ইসলাম যেভাবে বিশ্লেষণ করেছে অন্য কোন আইনে সেভাবে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ইসলাম যেকোন বিধান প্রয়োগের পূর্বে মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি করে। এজন্য সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরে হারাম উপার্জনের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি অপরের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান তথা হক্কুল ইবাদ সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং মানিলন্ডারিং এর মত বিভিন্ন অপরাধ দমনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মানিলন্ডারিং এর অর্থ কী করা হবে? আইনের দৃষ্টিতে কখন এ জাতীয় অর্থ বৈধ হিসেবে গণ্য হবে এ বিষয়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এছাড়া সম্পৃক্ত অপরাধের তালিকায় এমন কিছু অপরাধকে বাদ দেয়া হয়েছে যা ইসলাম ও মানবকল্যাণের দিক থেকে অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত। পক্ষান্তরে উপরের আলোচনা থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা একটি অপরাধ দখল ও নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যপঞ্জি

১. http://www.businessdictionary.com/definition/ money-laundering.html
২. http://www.bitpipe.com/tlist/Money-Laundering.html
৩. ড. হামদী আব্দুল আযীম: গাসিলুল আমওয়াল ফী মিসর ওয়াল আলামিল ইসলামী, প্রকাশক-গ্রন্থকার, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫।
৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯, (২০০৯ সনের ৮ নং আইন, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০০৯), ধারা-২/ট, পৃষ্ঠা-২।
৫. প্রাগুক্ত, ধারা-২/ঢ, পৃষ্ঠা- ২,৩।
৬. Doug Hopton: Money Laundering: A Concise Guide for all Business, Gower Publishing Limited, Hampshire, England-2006, Page-2.
৭. ড. হাদী কাশকুশ: জারিমাতু গাসিল আল-আমওয়াল ফী নিতাক আত্তাওয়াউন আদ্ দাউলী, দারুন নাহদা, বৈরুত, সনবিহীন, পৃষ্ঠা-৫৪।
৮. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯, ধারা-২/থ, পৃষ্ঠা-৩।
৯. প্রাগুক্ত, ধারা-৪ (১ ও ২), পৃষ্ঠা-৩।
১০. সূরা আলে ইমরান: ১৪।
১১. সূরা আল-কাহাফ: ৪৬।
১২. সূরা আত্ তাগাবুন: ১৫।
১৩. সূরা আল-আরাফ: ৩১।

১৪. সূরা আন্ নিসা: ৫।

১৫. সূরা আন্ নিসা: ৬।

১৬. সূরা আল-মাআরিজ: ২৪-২৫।

১৭. সায়াদ ইব্‌ন নাসের আশ্‌শারী: শরহ্ মানজুমাত আল-কাওয়ায়েদ আল-ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৯২। http://www.taimiah.org

১৮. হামদাতী শাবিহানা: মুকারানা বাইনাল জারাই ওয়াল হিল, মুজাল্লাতুল মাজমা আল-ফিকহ্ আল-ইসলামী, খ -৯, পৃষ্ঠা-১৫৮২। ইমাম শাতেবী: আল-ইতেছাম, খ -১, পৃষ্ঠা-২২৮।

১৯. সূরা আল-মায়িদা: ২।

২০. সূরা আন্ নিসা: ৫৯।

২১. উবাদাহ বিন সামেত বর্ণিত হাদীস, সহীহ্ বুখারী, (দারু ইব্‌ন কাছীর, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ-১৪০৭হি/১৯৮৭ ইং), খ -২, পৃষ্ঠা-২৬৩৩, হাদীস নং- ৬৭৭৪।

২২. কানযুল উম্মাল, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, ৫ম প্রকাশ, ১৪০১ হি/১৯৮১ ইং, খ -৩, পৃষ্ঠা-৮৭৪, হাদীস নং- ৮৯৯৩।

২৩. সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৮।

২৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী: তাফহীমুল কুরআন, (অনুবাদ: আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১২ প্রকাশ, ২০০৫) খ -২, পৃষ্ঠা-১২৪।

২৫. হাদীসটি মাওলানা মওদূদী (রহ) তার তাফসীরে কোন হাদীস গ্রন্থের উৎসসূত্র ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: তাফহীমুল কুরআন, (প্রাগুক্ত) খ -১, পৃষ্ঠা-৫৮।

২৬. সূরা আন্ নিসা: ২৯।

২৭. আল্লামা কুরতুবী: তাফসীরে কুরতুবী, খ -২, পৃষ্ঠা-৩৩৮।

২৮. তাফহীমুল কুরআন, (প্রাগুক্ত), খ -২, পৃষ্ঠা-১২৪।

২৯. সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭।

৩০. সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৭।

৩১. সহীহ্ মুসলিম, দারুল জীল, বৈরুত, সনবিহীন, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং-১২১৮।

৩২. বুখারী: কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং-১৯৭৭।

৩৩. মুসলিম: কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১০১৫।

৩৪. কায়িদা বলা হয় ঃ

قضايا كلية يندرج تحتها جزئية كثيرة لتعلم أحكامها من تلك القواعد وهي منطبقات على معظم جزئياتها غليبا

"এমন একটি সামগ্রিক বিষয় যার অধীনে অনেক গৌণ বিষয় প্রবিষ্ট হয়, উক্ত কায়িদা থেকে তাদের বিধান অবগত হওয়ার জন্য আর এ কায়িদা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অধিনস্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়।" দ্রষ্টব্য: ড. আব্দুল আযীয গাররাম: আল-কাওয়াঈদ আল-ফিকহিয়্যাহ, দারুল হাদীস, কায়রো-২০০৫, পৃষ্ঠা-১২।

৩৫. ইব্‌ন নুজাইম: আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০০ হি/১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৮৫, কায়িদা নং: ৫।

৩৬. শায়খ আহমদ মুহাম্মদ যারকা: শরহ কাওয়াঈদ আল-ফিকহিয়্যাহ, দারুল কলাম, দামেশক, সনবিহীন, পৃষ্ঠা- ২৬৩, কায়িদা নং-৪৯।

৩৭. শায়খ আহমদ যারকা: প্রাগুক্ত, কায়িদা নং- ৪৬, পৃষ্ঠা-১৪৪; ইব্‌ন নুজাইম: প্রাগুক্ত, কায়িদা নং- ৪, পৃষ্ঠা-১২০।
৩৮. শায়খ আহমদ যারকা: প্রাগুক্ত, কায়িদা নং- ৩৩, পৃষ্ঠা-১২৩; ইব্‌ন নুজাইম: প্রাগুক্ত, কায়িদা নং- ১৪, পৃষ্ঠা-১৫৮।
৩৯. সূরা আল-মায়িদা: ২।
৪০. জালালুদ্দীন সুয়ূতী: আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, কায়িদা নং- ৮, পৃষ্ঠা- ২৪০।
৪১. প্রাগুক্ত।
৪২. ইমাম শাতেবী: আল-মুআফাকাত, দারু ইবন্ আফ্ফান, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৭ ইং, খ - ৫ পৃষ্ঠা-১৮৭।
৪৩. যরায়িঈ শব্দটি যরীআহ শব্দের বহুবচন, যার আভিধানিক অর্থ- অসীলা বা মাধ্যম। উসূলে ফিকহর পরিভাষায় সাদ্দুয যারায়িঈ বলা হয় শরীয়াতের কোন বিধান উপেক্ষা বা সেক্ষেত্রে কোন কৌশল অবলম্বন, অথবা শরঈ নিষিদ্ধ কোন কাজে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে এমন সব পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা। (দ্রষ্টব্য: প্রফেসর মুস্তফা আয্‌যারকা: আল-ফিকহুল ইসলামী ফী সাওবিহিল জাদীদ, দারুল ফিকর, বৈরুত, সনবিহীন, খ -১, পৃষ্ঠা-৯৭)
৪৪. ড. নাযিয়াহ হামাদ: ক্বাদায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ, পৃষ্ঠা-৪৯।
৪৫. আল-মাবসুত, খ -৩০, পৃষ্ঠা-২৫৮। **http://www.al-islam.com**
৪৬. আল-মাবসুত, খ -৩০, পৃষ্ঠা-২৫০; মাহাসিবী: আল-মাকাসিব, পৃষ্ঠা-৯৩।
৪৭. ইমাম গাজ্জালী: ইয়াহইয়া উলুমুদ্দীন, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, সনবিহীন, খ -২, পৃষ্ঠা-১১৮।
৪৮. ইবন্ কাইয়ুম: যাদুল মাআদ, মাকতাবাতু আল-মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত, ১৪তম প্রকাশ, ১৯৮৬, খ -৫, পৃষ্ঠা-৭৭৮।
৪৯. ইমাম গাযালী: ইয়াহইয়া উলুমুদ্দীন, খ -২, পৃষ্ঠা-১১৩।
৫০. ইব্‌ন রজব আল-হাম্বলী: জামিউল ইলুম ওয়াল হুকম, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ- ১৪০৮ হি, খ -১, পৃষ্ঠা-২০১।
৫১. ইবন্ কাইয়ুম: বাদাঈ আল-ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাহ নায্‌যার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা, প্রথম প্রকাশ-১৪১৬, ১৯৯৬ ইং, খ -৩, পৃষ্ঠা-২৫৭; মাহাসিবী: আল-মাকাসিব, পৃষ্ঠা-৮৬।
৫২. সূরা আত্‌তওবাহ: (৩৪-৩৫)।
৫৩. সূরা আন্‌নিসা: ১৬১।
৫৪. সুনানে তিরমিযী, দারু ইয়াহইয়া আত্‌তুরাছ আল-ইসলামী, বৈরুত, সনবিহীন, হাদীস নং- ১২৯৫; সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, সনবিহীন, হাদীস নং- ৩৩৮১।
৫৫. মুসলিম, হাদীস নং- ২০০২।
৫৬. ইমাম হাকেম: আল-মুসতাদরিক আলাস্ সহীহাইন, হাদীস নং- ৫৭৪৮; সুনানে আবু দাউদ, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, সনবিহীন, হাদীস নং- ৩৬৮১; ইবন মাজাহ: হাদীস নং- ৩১৯২।
৫৭. সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ১২০৬।
৫৮. তিরমিযী: হাদীস নং- ১২৯৩।
৫৯. মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং- ৬১৬৫।
৬০. বুখারী: হাদীস নং- ৫০৩১, মুসলিম: হাদীস নং- ১৫৬৮।

৬১. ড. ইউসুফ কারযাভী: ইসলামে হালাল হারামের বিধান (মাওলানা আব্দুর রহীম অনূদিত), খায়রুন প্রকাশনী, ১৪ প্রকাশ, ২০০৮, পৃষ্ঠা-(১৮৮-১৯০)।
৬২. সূরা আল-মায়িদা: ৩৮।
৬৩. সূরা আল-মায়িদা: ৩৩।
৬৪. সূরা আলে ইমরান: ১৬১।
৬৫. সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫।
৬৬. সহীহ্ মুসলিম: হাদীস নং- ১৫৯৭, ১৫৯৮।
৬৭. সহীহ্ মুসলিম: হাদীস নং-২১১।
৬৮. হাকেম: আল-মুসতাদরিক, হাদীস নং- ২১৬।
৬৯. মুসলিম: হাদীস নং-১৬০৫।
৭০. মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং- ৬৫৩২, তিরমিযী: হাদীস নং-১৩৩৭, আবু দাউদ: হাদীস নং-৩৫৮২।
৭১. সূরা আল-মায়িদা: ৪২।
৭২. মুফতী মুহাম্মদ শাফী': তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষেপন: মাওলানা মহিউদ্দীন খান, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প) পৃষ্ঠা-৩৩১।
৭৩. সূরা আল-মায়িদা: (৯০-৯১)।
৭৪. হামদাতী শাবিহানা: মুকারানা বাইনাল জারাই ওয়াল হিল, মুজাল্লাতুল মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী, খ -৯, পৃষ্ঠা-১৫৮২। ইমাম শাতেবী: আল-ইতেছাম, খ -১, পৃষ্ঠা-২২৮।
৭৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন: আল-মাওসুয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ, কুয়েত, আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খ -৩৫, পৃষ্ঠা- (২৯৫-৩২৫)।
৭৬. বুখারী: ২/৭৭৯, হাদীস নং- ২১২১।
৭৭. ইসলামে হালাল হারামের বিধান, পৃষ্ঠা-১৯০।
৭৮. মাওসুআহ ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যাহ, খ - ১২, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৭৯. সহীহ্ মুসলিম, খ -৬, পৃষ্ঠা-১১, হাদীস নং- ৪৮৪৩। বুখারী, ২/৯১৭, হাদীস নং-২৪৫৭।
৮০. শরীয়াতে তা'যির বলা হয় ঐ অনির্ধারিত শাস্তিকে যা আল্লাহ্ বা বান্দার অধিকার খর্ব করার কারণে আবশ্যক হয় এবং যেসব অপরাধের কোন শাস্তি বা কাফ্ফারা নির্ধারিত হয়নি। (দ্রষ্টব্য: মাওসুআহ ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যাহ, খ - ১২, পৃষ্ঠা-২৫৪।)
৮১. আব্দুর রহমান নাসের আল-সাঈদী রচনা সামগ্র (ফিকহ অংশ, খ -২) মারকায সালেহ বিন সালেহ আছ-ছাকাফী, খ -৪, পৃষ্ঠা-৫৫৫।
৮২. হাশিয়াহ ইব্‌ন আবিদীন: ৩/১৮৩।
৮৩. ইব্‌ন তাইমিয়া: আস্‌সিয়াসাহ আশ্‌শারয়িয়্যাহ, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, সনবিহীন, পৃষ্ঠা-১৫১।
৮৪. ইব্‌ন আবিদীন: ৩/১৮৪।
৮৫. ইব্‌ন কুদামাহ: আল-মুগনী, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ-১৪০৫ হি, খ - ১০, পৃষ্ঠা-৩৪৮।
৮৬. ইব্‌ন আবিদীন: ৪/৩২৬; আল-মুগনী: ১০/৩১৩; আস্‌সিয়াসাহ আশ্‌শরিয়িয়্যাহ: ৫৪।
৮৭. আল-ফুরুক: ৪/৭৯; আল-ইতিসাম: ৪/১২০। সূত্র: ড. ওহাবাহ আল-যুহাইলী: আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, দারুল ফিকর, দামেশক, ১২তম প্রকাশ, খ -৭, পৃষ্ঠা-৫১৫।

৮৮. সুনানে আবু দাউদ, খ - ৪, পৃষ্ঠা- ৪৩৮; হাদীস নং- ৪৯৩০।
৮৯. মাওসুয়াহ ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যাহঃ ১২/২৬৯।
৯০. ইব্ন আবিদীনঃ ৩/১৮৪।
৯১. মাওসুয়াহ ফিকহিয়্যাহ কুয়িতিয়্যাহঃ ১২/ (২৬৯-২৭৩)।
৯২. প্রাগুক্তঃ ১২/২৭৪।
৯৩. ইব্ন আবিদীনঃ ৩/১৮৪, ১৯৭।
৯৪. সহীহ বুখারী, খ -১, পৃষ্ঠা- ১৯; হাদীস নং-৩০।
৯৫. সূরা নিসাঃ ৩৪।
৯৬. সূরা আত্তাওবাঃ ১১৮।
৯৭. সুনানে ইব্ন মাজাহঃ ২/৮৭১; হাদীস নং- ২৬১৩।
৯৮. আবু দাউদঃ ৪/২৭৭; হাদীস নং-৪৪৮০।
৯৯. আবু দাউদঃ ৪/২৪৮; হাদীস নং- ৪৪১৩।
১০০. ড. ইউসূফ কারযাভীঃ ফাতওয়া মুআসারাহ, খ -২, পৃষ্ঠা- ৪১১-৪১২।
১০১. মুসলিমঃ কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১০১৫।
১০২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল হালীম ওমরঃ আত্তাওবাহ মিনাল মাল আল-হারাম, মারকায সালিহ আব্দুল্লাহ কামিল, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর, সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১০-১১।
১০৩. হাকেমঃ আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, (দারুল উতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ-১৪১১ হিঃ/ ১৯৯০ ইং, ১/৫৪৮)হাদীস নং-১৪৪০; সহীহ ইব্ন হাব্বান, (মুআস্সাসাহ আর-রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ/ ১৯৯৩ ইং, ৮/১৫৩) হাদীস নং-৩৩৬৭; সহীহ ইব্ন খুযায়মা, (মাকতাবে আল-ইসলামী, বৈরুত, ১৩৯০ হি/১৯৭০ ইং, ৪/১১০) হাদীস নং-২৪৭১।
১০৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ, (মুআস্সাসাহ আর-রিসালাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ- ১৪২০ হিঃ/ ১৯৯৯ ইং), ৬/১৮৯, হাদীস নং- ৩৬৭২।
১০৫. আল-কারাফীঃ আল-ফুরুক, দারু আলিম আল-কুতুব, বৈরুত, সনবিহীন, খ - ২, পৃষ্ঠা- ১৪৯/১৫০।
১০৬. সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং- ২৫৮১।
১০৭. বায়হাকীঃ সুনানে কুবরা, হাদীস নং- ১৮৭২২।
১০৮. ইব্ন তুরকামানীঃ আজ জাওহার আল-নকী ফী শরহ আসসুনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ভারত, প্রথম প্রকাশ-১৩৪৪ হিজরী, খ - ৯, পৃষ্ঠ-১১৩।
১০৯. প্রাগুক্ত।
১১০. ইব্ন কাইয়ূমঃ আহকাম আহলুজ জীম্মাহ, দারু ইব্ন হাযম, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ-১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ খৃঃ, খ -১, পৃষ্ঠা-৩৪৫।
১১১. আবু উবাইদ কাসিম বিন সালামঃ কিতাবুল আমওয়াল, দারুল ফিকর, বৈরুত, সনবিহীন, খ -১, পৃষ্ঠা-১২৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ঃ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ১১৩-১১৫

সত্য ন্যায়বিচার ও সমতা ঃ ইসলামী আইনের ভিত্তি

এ. কে. এম. বদরুদ্দোজা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এখানে নৈতিকতা এবং আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে অন্যের পরিপূরক। ইসলামে ধর্ম থেকে নৈতিকতাকে আলাদা করা হয়নি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম যেখানে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে একগুচ্ছ আইন এবং বিধি নিষেধ রয়েছে। ইসলামী আইনের প্রধান উৎস হলো আল কোরআন যা আরবীতে আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল আঃ.-এর মাধ্যমে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা স.-এর উপর ২৩ বছর সময়কাল ধরে অবতীর্ণ হয়। ইসলামী আইন বা শরীয়ার মূল উৎস আল কোরআন হলেও সুন্নাহ ও এর একটি ভিত্তি। সুন্নাহ হলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা স.-এর বাণী, তার কাজ এবং যে সব কাজ তিনি সমর্থন করেছেন- এ তিনের সমাহার। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কতগুলো অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে যার ভিত্তিও আল কোরআন। ব্যাপক অর্থে ইসলামী আইন চারটি অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। যথাঃ (১)আল্লাহর অধিকার, যা পূরণ করতে প্রতিটি মানুষই বাধ্য, (২) নিজের উপর নিজের অধিকার, (৩) অন্য মানুষের অধিকার এবং (৪) আল্লাহ যে সব সম্পদ ও ক্ষমতা একজন মানুষের উপর ন্যস্ত করেছেন তার উপর তার অধিকার। ইসলাম এসব অধিকার ও দায়িত্বের সীমারেখা চিহ্নিত করেছে। সকল মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য হলো এসব অধিকার ও কর্তব্য অনুধাবন ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

প্রাচীন কাল থেকে তিন ধরনের আইনের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয়। যেমন ঐশী এবং ধর্মীয় আইন, নৈতিক আইন এবং মনুষ্য প্রণীত আইন। ঐশী বা ধর্মীয় আইন মূলতঃ সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ও বিধি নিষেধ সম্বলিত যা স্ব স্ব ধর্মের অনুসারীরা পালন করে। প্রাত্যহিক সালাত, যাকাত আদায় এবং হজ্জব্রত পালন এধরনের আইনের দৃষ্টান্ত। নৈতিক আইন মানুষের বিচার বিবেচনা বোধ ও সচেতন উপলব্দি থেকে উদ্ভূত। এগুলোর বিশ্বজনীন সর্বজনীন আবেদন আছে। যেমন- সত্যের মহত্ত্ব ও অন্যের উপর নির্যাতনের কালিমা সব সমাজেই স্বীকৃত। বিধিবদ্ধ আইন হলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি সমাজের অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর প্রণীত আইন যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের অধিকার সর্বোত্তম উপায়ে রক্ষা করে। এ সব আইনের একটি নির্বাহী সমর্থন থাকে, সচরাচর যা সরকার কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই তিন ধরনের আইনকে আলাদা করে রাখার এবং প্রতিটির

লেখক : গবেষক ও শিশু সংগঠক, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

জন্য আলাদা ক্ষেত্র নির্ধারণের একটি প্রবণতা কাজ করছে। যাতে ধর্মীয় আইন, নৈতিক আইন এবং বিধিবদ্ধ আইন এই ত্রয়ী একযোগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে চলতে পারে না। তার জের চলছে বাংলাদেশেও। বাহাত্তরের সংবিধান পুনর্বহালের নামে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ প্রবর্তনের কথা সরকারী মহল থেকে জোরেসোরে বলা হচেছ। ৫ম সংশোধনী বাতিল করে প্রদত্ত হাইকোর্টের যে রায়ের ভিত্তিতে ৭২ এর সংবিধান পুনর্বহালের কথা বলা হচ্ছে তাতে অনেক শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে। হাইকোর্টের ঐ রায়ে ৫ম সংশোধনী পুরোপুরি বাতিল হয়নি। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস সহ কিছু কিছু বিষয় বাতিল করা হয়েছে।

আপীল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখলে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের স্থলে ধর্মনিরপেক্ষতার সন্নিবেশিত হবে এবং ইসলাম রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা হারাবে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ইসলামকে নিছক ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার দু'টি অনুসঙ্গ, যার একটি হলো তাত্ত্বিক জ্ঞান, আরেকটি হলো প্রায়োগিক আইন। প্রায়োগিক আইন মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার , নিজের সাথে নিজের এবং অন্যের সাথে সম্পর্ক এই তিনটিকেই সম্পৃক্ত করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকার এবং কর্তব্য দুটি পরস্পর সম্পূরক ও পরিপূরক ধারণা। একে অন্যভাবে বলা যেতে পারে " একই মুদ্রার এপিট ওপিট"। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হবে। অধিকারের প্রকৃতি স্বেচ্ছাধীন। কেউ তার অধিকার ভোগ করতে পারে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু কর্তব্যের প্রকৃতি হলো বাধ্যতামূলক। ইসলামের মূলনীতি হলো মানুষ তার বৈধ চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণ এবং তার স্বার্থ সর্বোতভাবে রক্ষার মাধ্যমে সর্বাত্মক সাফল্য ও সুখ লাভের অধিকারী। কিন্তু লক্ষনীয় এই যে, এ অধিকার ভোগ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন করা যাবে না। সামাজিক সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতা সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। একারণে ইসলাম সামাজিক ও সংঘবদ্ধ জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে সমর্থন করেনা। বরং সকলে মিলে সামাজিক সমস্যাগুলো নিরসন এবং সকলের মঙ্গলের জন্য একটি ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ইসলামী আইনে অধিকার এবং কর্তব্য বিষয়ে তিনটি প্রধান অনুষঙ্গ রয়েছে। সেগুলো হলো সত্য বা আল-হক, ন্যায়বিচার বা আল আদল এবং সমতা বা আল কিস্ত। এ সব শব্দ আল কোরআনে বহুল ব্যবহৃত। তন্মধ্যে আল হক ব্যবহৃত হয়েছে সর্বোচ্চ ২৪৭ বার। আল কিস্ত ১৫ বার এবং আল আদল ১৩ বার। আল হক যুগপত, আল আদল এবং আল কিসতের অর্থ বহন করে। আল হকের বহুমুখী দ্যোতনার মধ্যে ৪টি অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে। যথা: সত্য, কর্তব্য, অধিকার এবং ন্যায়বিচার। আল হক আল্লাহর একটি নামও বটে। গোটা ইসলামী আইন এবং বিচার ব্যবস্থা সত্য, ন্যায় বিচার এবং সমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কারণে মদীনায় যখন একজন মুসলিম এবং একজন ইহুদী হযরত মুহাম্মদ স.-এর কাছে বিচার প্রার্থী হয় তখন তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেন। এর মাধ্যমে তিনি চিরকালের জন্য এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যে, বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম বর্ণের ভিত্তিতে কোন ব্যবধান নেই। ইসলামী আইনে সকল ধর্মাবলম্বীর

অধিকার সুরক্ষিত।

ইসলাম মানব রচিত যে কোন জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূণ স্বতন্ত্র এবং আলাদা। মানব রচিত জীবন ব্যবস্থায় ইহজগতই মূখ্য। এর লক্ষ্য হলো দুনিয়ার নশ্বর জীবনের সাফল্য, সুখ এবং শান্তি। ইসলাম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলকে কেবল ইহকাল পর্যন্ত সীমিত রাখেনি বরং তা প্রসারিত করেছে পরকাল অবধি। সেজন্য ইসলাম সততা, সৌন্দর্য, সুকুমারবৃত্তি, দক্ষতা এবং উন্নতির মতো উপাদনকে উৎসাহিত করে। মানুষের সৃজনশীল বিকাশকে ইসলাম অনুপ্রেরণা যোগায় এবং এ ক্ষেত্রে সকল শোষণ এবং অবিচার দৃঢ়ভাবে নাকচ করে। সেজন্য ইসলামী আইনে গোষ্ঠী বা গোত্রীয় সত্তা বা বর্ণবাদকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না।

মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য বিচার বিভাগের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আর বিচারকদের ন্যায় বিচারের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে " তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায় বিচার করো"। মানব রচিত আইনে বিচারকদের জন্য এ ধরনের কোন নৈতিক তাগিদ বা প্রণোদনা নেই।

ইসলামী আইনকে সেকেলে বা যুগের চাহিদা মিটাতে অক্ষম বলে অভিহিত করার কোন সুযোগ নেই। কারণ আল কোরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ইসলামী আইনের আরো দু'টি ভিত্তি রয়েছে, যথাঃ ইজমা ও কিয়াস। ইজমা হচ্ছে যে কোন ইস্যুতে ইসলামী ফিকাহবিদ ও চিন্তাবিদদের ঐক্যমত বা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে কিয়াস হচ্ছে যে কোন বিষয়ে ইসলামী ফিকাহ্ বিশারদ বা ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণালব্দ ধারণা বা সিদ্ধান্ত। ইজমা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী ফিকাহ বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা অনেক সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। সারা বিশ্বের বহুল প্রচারিত এবং বহুল সমাদৃত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইজমা এবং কিয়াসের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন। ইজমা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ইসলাম সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু এবং সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। ফলে ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনোই কোন সমস্যা হয়নি।

ইসলাম বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য আসেনি। এটি জাতি, বর্ণ, ভৌগলিক এলাকা নির্বিশেষে গোটা মানবতার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী আইন, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে গোটা মানবতার কল্যাণের জন্য নিয়োজিত। বিচারের ক্ষেত্রে ইসলাম বিচার প্রার্থীদের ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয়ের উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ইসলামী আইন এবং এর অধীনে স্থাপিত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝঞ্জা বিক্ষুদ্ধ বিশ্বে ইনসাফ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০১০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ২১, পৃষ্ঠা ঃ ১১৯-২২১

দেশে দেশে ইসলামী আইন

নাইজেরিয়ায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা
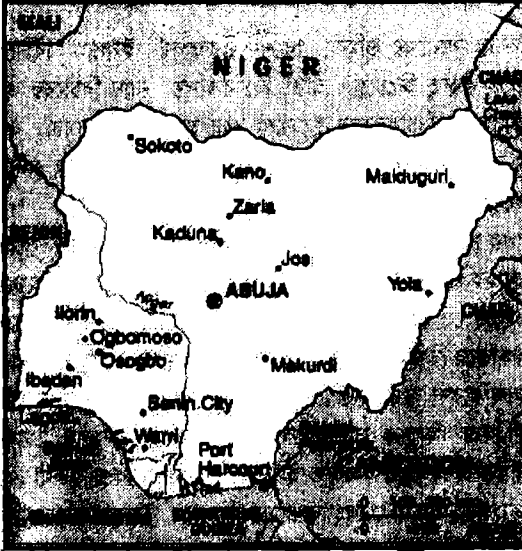
আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ নাইজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এর আয়তন ৯,২৩,৭৬৮ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা সাড়ে ১৫ কোটি।

শাসন ব্যবস্থা ঃ এখানকার নাইজার নদীর নাম থেকেই নাইজেরীয়া নামটি রাখা হয়েছে। তেল সমৃদ্ধ দেশটি ১৯৭১ সালে ওপেকে যোগ দেয়। নাইজেরিয়া আফ্রিকার দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। ১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর দেশটি যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত চলেছে সামরিক শাসন। দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা,জাতিগত বিরোধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা নাইজেরিয়ার অন্যতম সমস্যা। এতে ৩৬টি রাজ্য এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজধানী রয়েছে। রাজ্যগুলো উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত। বৃটিশ উপনিবেশবাদের সুবাদে খৃষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কাঠামোগত অনেক উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে মুসলিম অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল অনুন্নত থেকে যায়। গোটা দেশ জুড়ে রয়েছে ২৫০ এরও বেশী জনগোষ্ঠীর বসবাস, যাদের ভাষা, প্রথা, সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তবে মুসলিম (৫৩%) ও খৃষ্টান (৪০%) ধর্মাবলম্বীরাই প্রধান।

বিচার ব্যবস্থা ঃ বৈচিত্রময় দেশটিতে চার রকম আইন রয়েছে ঃ (ক) ইংলিশ ল' যা বৃটিশ ঔপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত। (খ) কমন ল' যা স্বাধীনতা উত্তর নাইজেরিয়ার স্থানীয় চেতনায় গড়ে উঠেছে। (গ) প্রতাগত আইন যা উপজাতীয় সমাজের রীতি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। (ঘ) শরীয়া আইন যা প্রধানত উত্তর নাইজেরিয়ার রাজ্যগুলোর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে। শরীয়া আইন বৃটিশ আগমনের পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং ইদানিং আধুনিক নাইজেরিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসিত। এর বিচার ব্যবস্থা নিম্নরূপ ঃ

(ক) সুপ্রীম কোর্ট অফ নাইজেরিয়া।

(খ) কোর্ট অফ এ্যাপীল।

(গ) ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হাইকোর্ট।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজধানী এলাকা (Federal Capital Territory) তথা আবুজার জন্য রয়েছে ।

ক. হাইকোর্ট

খ. শরীয়া এ্যাপীল কোর্ট (Sharia Court of Appeal)

গ. প্রথাভিত্তিক এ্যাপীল কোর্ট (Customary Court of Appeal)

পাশাপাশি নাইজেরিয়ার প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য রয়েছে ঃ

(ক) হাইকোর্ট।

(খ) শরীয়া এ্যাপীল কোর্ট।

(গ) প্রথাভিত্তিক এ্যাপীল কোর্ট।

উপরোক্ত প্রতিটি কোর্টের গঠন, বিচারকের সংখ্যা, যোগ্যতা, নিয়োগ, আইনের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) ইত্যাদি নাইজেরিয়ার সংবিধানের ৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্ট অফ এ্যাপীল-এ নূন্যতম এমন তিনজনকে নিয়োগ দেয়া হয় যারা ইসলামিক পার্সোনাল ল' বিশেষজ্ঞ।

আবুজা'র শরীয়া কোর্ট ঃ আবুজা হলো নাইজেরীয়ার কেন্দ্রীয় রাজধানী (Federal capital Territory) এখানে একটি শারীয়া এ্যাপীল কোর্ট রয়েছে যা একজন গ্রান্ড কাজী ও বেশ কিছু কাজীর সমন্বয়ে গঠিত। কাজী অথবা গ্রান্ড কাজীর যোগ্যতা হলো তাকে অবশ্যই জাতীয় জুডিশিয়াল কাউন্সিল অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ইসলামী আইনে পারদর্শীতার পাশাপাশি নাইজেরিয়ার অভ্যন্তরে কম্পক্ষে ১০ বছর আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। অথবা ইসলামী আইনে উক্ত ব্যক্তির অবদান বিবেচনা সাপেক্ষে উপরোক্ত শর্তাবলী শীথিলযোগ্য হতে পারে। উল্লেখ্য, জাতীয় জুডিশিয়াল কাউন্সিল এর সুপারিশে প্রেসিডেন্ট একজনকে গ্রান্ড কাজী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন যা অবশ্যই সেদেশের সিনেট কর্তৃক চূড়ান্ত হতে হবে। আর জাতীয় জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশে প্রেসিডেন্ট একজন কাজী পদে নিয়োগ দিতে পারেন। শরীয়া কোর্টের মোট কাজীর সংখ্যা নির্ধারিত হয় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ -এর সংখ্যানুপাতে।

সংবিধানের ২৬২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ইসলামিক পার্সোনাল ল'এর আওতাধীন দেওয়ানী বিচার কার্যগুলোই আবুজা শরীয়া এ্যাপীল কোর্টের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction)। তাই নিম্নবর্ণিত জটিলতা নিষ্পত্তির মধ্যে এই কোর্টের কার্যক্রম সীমিত; যেমন- বিবাহের বৈধতা দান ও বিবাহ বিচ্ছেদ, রক্তসম্পর্ক নির্ণয়, শিশুর অভিভাবকত্ব গ্রহণ, ওয়াক্ফ, হেবা, ওয়াছিয়ত এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন। এই কোর্টে বাদী ও বিবাদী উভয়ের ইচ্ছা ও সম্মতিতে মামলা গৃহীত ও শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। আবুজা শরীয়া এ্যাপীল কোর্ট এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য জাতীয় পরিষদের অনুমতি নিয়ে গ্রান্ড কাজী কোন বিশেষ আইন বা নিয়ম জারী করতে পারেন।

অঙ্গরাজ্যভুক্ত শরীয়া এপীল কোর্ট

কোন অঙ্গরাজ্য চাইলে সেখানে সংবিধান অনুযায়ী একটি শরীয়া এপীল কোর্ট স্থাপন করতে পারে। একজন গ্রান্ড কাজীর অধীনে রাজ্য সভাকর্তৃক অনুমোদিত সংখ্যক কাজীর সমন্বয়ে এই কোর্ট গঠিত হবে। জাতীয় জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশে রাজ্য গভর্নর এই কোর্টের গ্রান্ড কাজীকে নিয়োগ দেন যা রাজ্য সভায় (House of State) চূড়ান্ত করা হয়। আর একজন কাজীর নিয়োগ জাতীয় জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশে রাজ্য গভর্নর চূড়ান্ত করেন। কাজী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। কমপক্ষে দশ বছর ইসলামিক ল'বিষয়ে নাইজেরিয়ার আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার অভিজ্ঞতা ও পাশাপাশি জাতীয় জুডিশিয়াল কাউন্সিল অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত যোগ্যতা বা ডিগ্রী থাকতে হবে, তবেই কেবল বিচারক হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন। যদি তিনি এই ডিগ্রি কমপক্ষে ১০ বছর পূর্বে অর্জন করে থাকেন। এছাড়া যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও অবদান বিবেচনাপূর্বক নিয়োগ প্রাপ্তির শর্ত শিথীল হতে পারে। অঙ্গরাজ্যভুক্ত শরীয়া এপীল কোর্টের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) উপরে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় রাজধানী আবুজা'র শরীয়া আপীল কোর্টের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) এর মত।

১৯৯৯ সাল থেকে নাইজেরিয়ার মোট ৩৬টি অঙ্গরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় অনেকগুলো ছোট বড় প্রদেশে শরীয়া এপীল কোর্ট এই স্থাপিত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেমন ঃ- কানো, জামফারা, ক্যাটিসনা, নাইজার, বাউচি, বরনো, কাদুনা, গোম্বা, ছোকোটো, জিগাওয়া, ইউবো, কেব্বি। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা নাইজেরিয়ার শরীয়া এপীল কোর্টের অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) আরো বৃদ্ধি করার সুপারিশ করছেন।

- তারেক মুহাম্মদ জায়েদ

প্রশ্নোত্তর

❑ মুহাম্মদ জুনাইদ, পাবনা

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আইনের পরিধি কতোটুকু ?

উত্তর ঃ প্রথমেই জানা দরকার-ইসলামী আইন বলতে আমরা কি বুঝি? সংক্ষেপে বলা যায়, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ স. মুসলিম উম্মাহকে যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন-এই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাই (Ordinances) হলো ইসলামী আইন। এ আইন আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন বিশ্বাস সংক্রান্ত আইন, ইবাদত সংক্রান্ত আইন এবং লেনদেন (মুআমালাত) সংক্রান্ত আইন। শেষোক্ত ভাগের আইনের বেষ্টনী অতি ব্যাপক, প্রশাসন, বিচার, অর্থনীতি, সমাজনীতি অর্থাৎ মানবজীবনের সার্বিক দিক পরিবেষ্টন করে আছে এই আইন।

পাশ্চাত্যমুখী বা বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ আইন বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধান আইনের আওতাভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় এসবও আইনের আওতাভুক্ত। যেমন কোনো ব্যক্তি নামায না পড়লে সে ইসলামী আইনের আওতায় অপরাধী, শুধু অপরাধীই নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধী। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে সে মোটেই অপরাধী নয়। তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো পদক্ষেপ নিলে উল্টো সেই অপরাধী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, মানব জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রম ইসলামী আইনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সমাজ, সভ্যতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিনের প্রতিটি কার্যক্রমই ইসলামী আইনের পরিধিভুক্ত। আপনি কোনো কাজ করতে চাইলে প্রথমেই চিন্তা করেন-শরীয়ত এ কাজ অনুমোদন করে কিনা। অন্য কথায়, শরীয়ত মোতাবেক এটি করা জায়েয কিনা। এমনকি আপনি মহাশূন্য ভ্রমণে বের হলেও ইসলামী আইন আপনার সাথে যায়। নামায পড়ার জন্য উযু করতে সাথে পানি বা মাটি নিয়ে যেতে হয়ে।

❑ আবু যাওয়াদ, শ্যামলী, ঢাকা

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত আইনের সাথে ইসলামী আইনের সামঞ্জস্য কতোটুকু?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূচনাকাল থেকে মানবজাতি আসমানী বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। আদম হাওয়া আ.-কে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট পথনির্দেশ যেতে থাকবে" (২ঃ৩৮)। এজন্যই গোটা মানবজাতির মধ্যে কার্যকর বিধিমালার একটি বিরাট অংশের সাথে ইসলামী আইনের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তাই বলে তাকে আমরা ইসলামী আইন হিসেবে স্বীকার করে নিতে পারি না। ইহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের বহু বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও তিনটি ধর্মই পৃথক পৃথক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত।

অতএব আমরা বলতে পারি, প্রচলিত বহু বিধানের সাথে ইসলামী বিধানের সামঞ্জস্য থাকলেও প্রথমোক্ত বিধানগুলো ইসলামী বিধান নয়। যে বিধান প্রণয়নের পশ্চাতে ইসলামী শরীয়তের প্রাণসত্তা কার্যকর থাকে, কুরআন ও হাদীস সামনে থাকে এবং তার দ্বারা ইসলামী জীবনধারাকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে সেটিই ইসলামী বিধান।

লেখক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১. ত্রৈমাসিক 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকায় লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা ইসলামী আইন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে হতে পারে। তবে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বীমা ও তুলনামূলক আইনী পর্যালোচনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২. চলিত ভাষায় লিখতে হবে।
৩. গবেষণার নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।
৪. আয়াতের আরবী (হরকতসহ) দিতে হবে এবং সূরা নং ও আয়াত নং উল্লেখ করতে হবে।
৫. হাদীসের ক্ষেত্রে মূল আরবীসহ তরজমা দিতে হবে, কিতাব (অধ্যায়), বাব (অনুচ্ছেদ) নং ও হাদীস নং প্রকাশক ও প্রকাশকালসহ দিতে হবে।
৬. অন্যান্য গ্রন্থের বেলায় লেখক, পুস্তক, খন্ড, প্রকাশক, প্রকাশের কাল ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।
৭. লেখা কাগজের এক পিঠে হতে হবে এবং সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় ফাঁক থাকতে হবে।
৮. লেখা মুদ্রিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে।
৯. অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।
১০. সংস্থার ইমেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠানো যাবে। ই-মেইল প্রেরণ করে সংস্থার অফিসে ফোনে জানাতে হবে।

ই-মেইল- islamiclaw_bd@yahoo.com এবং
ফোন- ০১৭১৭ ২২০৪৯৮

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
নোয়াখালী টাওয়ার, (স্যুট-১৩/বি)
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার নতুন বিভাগ

প্রশ্নোত্তর

এ সংখ্যা থেকে চালু হলো
ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।
ইনশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে।

- সম্পাদক

এক নজরে

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার এর কার্যক্রম

০১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন

খ. মুসলিম পারিবারিক আইন

গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার

ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস

ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন

চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারীতা উপস্থাপন

০২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ

খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা

ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা

ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

০৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার

খ. জাতীয় আইন সেমিনার

গ. মাসিক সেমিনার

ঘ. মতবিনিময় সভা

ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

০৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষাম্মাসিক)

গ. আরবী জার্নাল (ষাম্মাসিক)

ঘ. মাসিক পত্রিকা

ঙ. বুলেটিন

০৫. বুক পাবলিকেশন্স প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ

খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ

গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা

ঘ. ইসলামী আইন কোড

ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

০৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম

খ. আইনজীবি ভিত্তিক লেখক ফোরাম

গ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম

ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ

ঙ. লেখক সম্মেলন

০৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/ কিতাব সংগ্রহ

খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/ কিতাব সংগ্রহ

গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/ কিতাব সংগ্রহ

ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই / কিতাব সংগ্রহ

ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/ কিতাব সংগ্রহ

০৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা

খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা

গ. ই-লাইব্রেরী

ঘ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় প্রতি সংখ্যা........কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ..

....

বয়স.................. পেশা...

ফোন/মোবাইল ঃ...................................সহজলভ্য মাধ্যম ঃ ডাক/কুরিয়ার ফরমের সঙ্গে..........................টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর
গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট নং-১৩/বি, (লিফ্ট-১২), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৯১৭-১৯১৩৯৩
E-mail : islamikclaw_bd@yahoo.com, www.ilrcbd.com

সংস্থার একাউন্ট নং
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
MSA-8872 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয়।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ-১৬০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন ২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।
=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৪০×৪=১৬০/=
=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ৪০×৮=৩২০/=
=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ৪০×১২=৪৮০/=